KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৭/- ৭/- ৭/- ৭/- ৭/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ আষাঢ়, ১৩৬৬ শ্রাবণ, ১৩৬৬ ভাদ্র, ১৩৬৬ আশ্বিন, ১৩৬৬
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ
কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

বই-এর নাম — লেখক

১। রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
২। হাতের রেখায় জীবন রহস্য—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড
৩। Expression & Language of the Unconscious—Sri Sabyasachi
৪। নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব—শ্রীসব্যসাচী
৫। নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী
৬। জ্যোতিষী শিক্ষা—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০'০০,
৭। Jyotish Sanchayan
৮। Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hints
Answer—Viswanath Deva Sarma
৯। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
১০। Table of Ascendants & Ephemeris—By N. C. Lahiri
১১। লঘুজাতকম্- অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
১২। বৃহৎজাতকম্—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৩। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
ঐ ৩য় খণ্ড
১৪। গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল ডাঃ রণতোষ সাহা
১৫। ফলদীপিকা—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৬। ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৭। জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ—শ্রীমলয় রায়
১৮। মিথ্যা নয়, সত্য—প্রীতি রায়
১৯। গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল—ডাঃ রণতোষ সাহা

ভি পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১০.০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অগ্রিম

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তম বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০

ঐক্য
ও
সমন্বয়ের
সাধনায় ...

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—
বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের
সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল
ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই
মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার
ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা
ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্প-
কলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ
বল্লম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল-
বাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত
তরুণীদের রাসনৃত্যে ও
মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও
কীর্তনে তা স্তিমিত ও
ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা
মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে,
গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ
ভারতের ভারতনাট্যম্ ও
কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র
ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই
আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই
বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির
ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের
প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

জ্যৈষ্ঠ ॥ সপ্তম বর্ষ ॥ ১৩৬৬

॥ সূচীপত্র ॥

প্রবন্ধ ॥ জেমস প্রিন্সেপ। সোমেন বসু ১০৫
প্রকৃতি পর্যবেক্ষক কালিদাস। ব্রহ্মচারিণী বাসনা ১১৩
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে। রণেন্দ্রনাথ দেব ১১৭
উপন্যাস ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭
কবিতা ॥ অলাতচক্র। বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ১৩৫
এক ইচ্ছার মৃত্যু। অসিত দত্ত ১৩৬
আলোচনা ॥ মিছিল নগরী। উৎপল চৌধুরী ১৩৭
নাটক পাঠকের সমস্যা কি? ॥ রবি মিত্র ১৩৮
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ কলাসমালোচনায় অবনীন্দ্রনাথ। মীরা দত্ত ১৪১
সমাজ সমস্যা ॥ সংস্কৃতি নিয়ে মাথাব্যথা। নিরঞ্জন হালদার ১৪৪
সমালোচনা ॥ মঞ্জুলা বসু। জয়ন্ত গোস্বামী। মলয় দাশগুপ্ত ১৪৯

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

উ ল্লে খ যো গ্য ব ই ও প ত্র প ত্রি কা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তসার) দাম ঃ এক টাকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তবিবরণী) দাম ঃ ছয় আনা

॥ ছো ট দে র জ ন্য ॥

দেশ-বিদেশের উপকথা

মনোজিৎ বসু

দাম ঃ এক টাকা

যারা দেখাল নতুন আলো

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গুঞ্জন

দীপ্তি সেনগুপ্তা

ছুটির দিনের কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেল-নুন-কড়ি

শ্যামাপ্রসাদ আচার্য

চলার পথে—বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

জয় যাত্রা—নীলিমা সেন

ভারত আমার

সতীকুমার নাগ

দামোদর

বিশ্ব বিশ্বাস

প্রতিটি বই সচিত্র এবং দাম চার আনা

হাতের কাজ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

প্রতি খণ্ড পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

আমাদের পতাকা

দাম—পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য-বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

উইক্‌লি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ১·৫০ টাকা;

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল

উর্দুভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

অনুসন্ধান করুন

(বইয়ের জন্য) পাব্‌লিকেশন্‌ সেল্‌স-অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

(পত্র-পত্রিকার জন্য) **প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,** রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা ১

স ম কা লী ন
স প্ত ম ব র্ষ
জ্যৈষ্ঠ । ১ ৩ ৬ ৬

জেমস প্রিন্সেপ

সোমেন বসু

মন ছিল বৈজ্ঞানিকের; দৃষ্টি ছিল শিল্পীর। বর্তমানকে সুন্দর করে তোলার জন্য ছিল সাধনা আর অতীতের বাণী অন্তরে পৌঁচেছিল গোপনে। সেই নিরলস বিজ্ঞান সাধক সেই সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন জেমস প্রিন্সেপ।

বিদেশী শাসনব্যবস্থা যে কটি ভারতপ্রেমিক সৃষ্টি করতে পেরেছিল জেমস প্রিন্সেপ তাদের অন্যতম। বাংলার নবজাগরণের সিংহদুয়ারে তাঁরা অর্ঘ বয়ে এনেছিলেন, পথ প্রশস্ত করেছিলেন—একটি মহান জাতির নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে পূর্ব দিগন্তের বাতায়ন খুলে রেখে-ছিলেন,—দীপ্ত সূর্যের প্রভাতী আশীর্বাদ যেন ব্যর্থ না হয়।

প্রাচীন ভারতের লুপ্ত গৌরবের দিকে যাতে দৃষ্টি ফেরে তারই নিরলস সাধনা পিছনে রেখে গেলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, উইলসন, জেমস প্রিন্সেপ।

১৭৯৯ সালের ২০শে আগষ্ট জেমস প্রিন্সেপের জন্ম। পিতা জন প্রিন্সেপ পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন, অল্ডারম্যান ছিলেন লন্ডনের। ভারতবর্ষ ইতালি ও ইংলন্ড জুড়ে বাণিজ্যের যে বিস্তৃত জাল তিনি ফেলেছিলেন তাতে প্রভূত ঐশ্বর্যের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ বণিকদের ব্যবসার অবাধ সুযোগের জন্য লড়াই করে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে সে অধিকার আদায় করতে পেরেছিলেন তিনি।

জেমস প্রিন্সেসের বাল্যশিক্ষা কোন সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত পথ ধরে চলেনি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাজতিলক তাঁর ললাটে পড়েনি। মাত্র দুটি বছর একটি স্কুলে কাটলো—তারপর বালকজীবনে আর কোন শাসনের বা বিধিনিষেধের চাপ পড়লোনা। ভাইবোন সংখ্যায় ছিল অনেক। তাদের সঙ্গে গান গেয়ে আনন্দে দিন কাটতো। পড়াশুনো আর যা হলো তা বাড়ীতেই হলো।

অল্প বয়সে যে দুটি বিষয়ের প্রবণতা তাঁর জীবনে দেখা গেল তা হলো সংগীত ও স্থাপত্য।

পরবর্তী জীবন প্রমাণ করছে যে তিনি ছিলেন জাত-শিল্পী। কল্পনা করতে পারি এক মানবসন্তানকে, মুক্ত প্রাণের আনন্দে ক্লিফটনের বিস্তৃত প্রান্তরে প্রান্তরে উদ্দাম আবেগে কণ্ঠ-

ভরা গান নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখছে দুটি অবাক বিস্ময়েভরা চোখে এই বিপুল পৃথিবীকে। তখন ও বালক মাত্র।

একটি ছোট গাড়ী তৈরী করেছিলেন নিজের হাতে। কি নিখুঁত ছিল দৃষ্টি। দরজা জানলা সবই ছিল বড় গাড়ীর মত। আজও বালক প্রিন্সেপের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সেই গাড়ী তাঁর পারিবারিক বন্ধুরা সযত্নে রক্ষা করছেন।

কিন্তু বালক তো চিরকাল নাবালক থাকবেনা। বয়স তো বাড়ছে। এদিকে পিতার ব্যবসা ধাক্কা খেয়েছে জোর। কিছু তো করতে হয়। শেখেনি কিছুই; করে কি! কিন্তু বড় কাজ করবার জন্যে যাদের জন্ম তারা তো কাজ শেখেনি বলে আসেনা।

ছবি আঁকায় হাতছিল। স্থাপত্য শিখলে কেমন হয়। তাই হলো। মনে করলেন জীবনের একটা ধারা পাওয়া গেল। নূতন উদ্যমে উইলকিন্স নামে এক ভদ্রলোকের কাছে শিখতে গেলেন কাজ। কিন্তু বাধা এলো অপ্রত্যাশিতভাবে। যন্ত্রের সূক্ষ্ম প্রয়োগ শিখতে গিয়ে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলো। প্রথম চেষ্টাতেই এই অসাফল্য আর এই আকস্মিক দৈহিক বিড়ম্বনা একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আবার কিছুকাল গেলো— জীবনের কোন উদ্দেশ্য স্পষ্ট নেই। কোন কাজ নেই। অবসন্ন কর্মহীন দিন চলতে লাগলো একে একে। জন প্রিন্সেপ সুদীর্ঘকাল ব্যবসাসূত্রে জড়িত ছিলেন ভারতবর্ষের সঙ্গে। বহু চেনাশোনা, বহু পরিচিত লোক সেখানে। ঠিক করলেন মিন্টের Assay বিভাগে একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায় ছেলের। সেই হিসাব করে লন্ডনের রয়েল মিন্টে সাহেবের কাছে জেমসকে পাঠালেন। অল্প দিনের মধ্যেই কর্মদক্ষতার প্রশংসাপত্র পেলেন আর তারই জোরে কলকাতার মিন্টে 'এসে' মাষ্টার হবার কাজও জুটে গেল।

১৮১৯ সাল—

বিশ বছর বয়সে 'হুগলী' জাহাজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন জেমস প্রিন্সেপ। অটুট সুন্দর স্বাস্থ্য, দৃষ্টিশক্তি চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ, মনে অদম্য উৎসাহ, বুকে অফুরন্ত আশা। কে জানতো সেদিন এই মিন্টের মামুলী চাকরীর পিছনে ভারত তথা পৃথিবীর সভ্যতা একটা কতবড় সত্যউদ্ঘাটনের জন্য এই বিশ বছরের যুবকের পথ চেয়ে আছে। কে জানতো যে ঠিক আরো বিশ বছর ধরে কর্মক্লান্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে মাত্র এক বছরের জীবন হাতে নিয়ে তিনি ফিরে আসবেন।

ইংলন্ডের বিশ বছর তাঁর কেটেছে হাসিখেলায়, গানে, ভারতবর্ষের বিশ বছর কাটলো প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততায়, সাধনায় ইতিহাসের অজ্ঞাত রহস্য সন্ধানে।

সঙ্গে এল ছোটভাই টমাস ইঞ্জিনীয়ারের কাজ নিয়ে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮১৯ সাল কলকাতায় এসে পৌঁছালেন জেমস প্রিন্সেপ।

কলকাতার মিন্টে চাকরী করতে গিয়েই পরিচয় হলো হোরেস হেম্যান উইলসনের সঙ্গে। সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হিসাবে সুনাম তাঁর সুদূর প্রাচ্যে। কোন আশীর্বাদে এমন গুরুর সঙ্গে দেখা হলো কলকাতায়। সে প্রভাব ছড়িয়ে গেল তাঁর জীবনে তাঁর অন্তরে নতুন জগতের আলো জেলে দিলে। পরবর্তীকালে প্রিন্সেপের 'Essays on Indian Antiquition' যখন ছাপা হলো তখন সেই গ্রন্থের সম্পাদক এডওয়ার্ড টমাস তা উৎসর্গ করলেন হোরেস হেম্যান উইলসনকে। প্রিন্সেপের ভাই তাঁর স্মৃতিকথা লিখছেন "James Prinsep was appointed to serve under Dr., now Professor H. H. Wilson then Assay Master of Calcutta and so formed an acquaintance which had great influence upon

the pursuits of his after life.

নতুন মিন্ট তৈরী হবার পরিকল্পনা চলছে তখন বারাণসীতে। উইলসন গেলেন সেখানে মিন্ট সুরু করার প্রাথমিক কাজ করতে। প্রায় এক বছর সেখানে তাঁকে থাকতে হলো সেই অবকাশে অধিকতর কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করলেন জেমস।

বারাণসী থেকে উইলসন ফিরে আসার পর প্রিন্সেপকে পাঠানো হলো সেখানকার নতুন মিন্টের ভার দিয়ে।

প্রিন্সেপ খুসী হলেন। বিশাল ভারতবর্ষকে দেখবার ও জানবার ব্যাকুলতা ছিল। তার কিছুটা তো মিটবে। স্থলপথ দিয়ে তাই গেলেন না। চললেন জলপথে গঙ্গাবক্ষে তখনকার দিনে অভিজাত সম্প্রদায় তাই করতেন। শিল্পী জেমসের ভিতরকার সুপ্ত মানুষটি পুণ্যপ্রবাহিনী গঙ্গার স্পর্শে জেগে উঠলো। ছবি আঁকা বন্ধ ছিল কতকাল। আবার নেচে উঠলো হাতের আঙ্গুলগুলো মনের ছবিকে কাগজে ধরে রাখতে। সে ছবিগুলো সযত্নে রক্ষা করছেন তাঁর পারিবারিক বন্ধুরা।

পুণ্যতীর্থ বারাণসী —পাশে চলেছেন মন্ত্রধারা সুরধুনী। সে কোন বিস্মৃত দিন থেকে বারাণসীর পথে ছুটে চলেছে মৃত্যুশঙ্কিত মানুষ—কোন পুণ্যার্জনের, কোন পাপস্খালনের উৎকণ্ঠিত আশায়। সেখানকার সুনীল আকাশ প্রতি সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের বন্দনামন্ত্রে ভরে উঠেছে। মন্দির প্রকোষ্ঠের অলংকৃত প্রান্তদেশে সচকিত হয়ে উঠেছে সুখসুপ্ত পারাবত।

সেখানে এসে দাঁড়ালেন সাগরপারের মন্ত্রাপ্রস্তত বিশারদ জেমস প্রিন্সেপ। দেখলেন দেবতাই সর্বেসর্বা। যত মানুষ আসে সারা ভারত থেকে একমন্ত্র তাদের কণ্ঠে—বিশ্বেশ্বর মুক্তি দাও। বিশ্বেশ্বরের প্রাকার অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে—মানুষকে ছাড়িয়ে বিশ্বেশ্বর এত বড় হয়েছেন যে মানুষও নিজেকে ভুলেছে।

মন্দিরের বাইরে যে বারাণসী, কি বিশ্রী ছিল তার রূপ। পথঘাট বলতে কিছু নেই, খানা ডোবায় পরিকীর্ণ, রোগ ও অস্বাস্থ্যের কেন্দ্র। কেমন করে বাঁচে মানুষ —কে ভাবে সে কথা। বাঁচার জন্যে তো বারাণসী নয়—জীবনপ্রান্তে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করতেই তো মানুষ আসে বারাণসীতে।

সুন্দরের উপাসক তিনি—মন্ত্রাপ্রস্তুতের কাজটা তো জীবিকা সে তো জীবন সাধনা নয়। বারাণসীর পুণ্যভূমিতে সেই সুন্দরের উপাসকের উদ্বোধন হলো।

মিন্টের জন্য যে নতুন বাড়ী হচ্ছিলো সেই বাড়ী দেখেই মেজাজ বিগড়ে গেলো প্রিন্সেপ সাহেবের। মিলিটারী ব্যারাক ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারের উপর ভার ছিল বাড়ী তৈরীর। মিন্টটাও হচ্ছিল সেই ব্যারাক জাতের। সিধে খাড়া দেওয়াল, কোথাও কোন কারুকার্যের বালাই নেই।

একটা নতুন প্ল্যান তৈরী করলেন প্রিন্সেপ। মনের রং দিয়ে আবেগ দিয়ে, সৌন্দর্যবোধ দিয়ে। কলকাতায় লিখে পাঠালেন যে, যে টাকা খরচ হবে বলে ঠিক করা হয়েছে সেই টাকাতেই তিনি আরও ভাল বাড়ী করে দেবেন।

সৌভাগ্যই বলতে হবে কলকাতার কর্তৃপক্ষ রাজী হয়ে গেলেন। স্থাপত্যে তাঁর দক্ষতা প্রমাণের প্রথম সুযোগ মিললো বারাণসীর মিন্ট তৈরীর কাজে। সে কাজ সম্পূর্ণ হতে না হতেই আরও কাজের ডাক এলো। একটা নতুন গির্জা তৈরী হবে। বিশ্বেশ্বরের পাশে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র যীশুখৃষ্টের আসন পাতা হবে। য়ুরোপীয় সমাজ তাদের একটি প্রার্থনাগৃহ নির্মাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সেই কাজের ভার পড়লো প্রিন্সেপের উপর।

কিন্তু মুদ্রা নির্মাণ আর গৃহ নির্মাণে জেমস প্রিন্সেপের মন ভরে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে তাঁর মন। পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন, রসিক লোক জুটিয়ে সাহিত্যসভা বসান— সেই সাহিত্য সভার প্রচারের জন্য ছাপাখানা খোলেন।

অযাচিতভাবে এই সময় সরকার থেকে একটা সুযোগের প্রস্তাব এলো। বারাণসীর উন্নতি করতে হবে—সুন্দর করো সহরটাকে—অর্থের জন্য ভেবোনা।

বাড়ী তৈরীর চেয়ে বড় কাজ তো বটে। সহরকে সহর নতুন করে গড়ে তোলা।

পুরাকালের বারাণসী রোগগ্রস্ত রমণীর মত জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে পড়েছিল। তারই উপরে অস্ত্রোপচারের ভার পড়লো প্রিন্সেপের। শীর্ণ জীর্ণ দুর্গন্ধময়, অসূর্যম্পশ্যা পথগুলিকে কেটে কেটে বড় করা হলো যতদূর সম্ভব। পথের দুদিকে নালা কেটে জলনিকাশের ব্যবস্থা হলো—সহর থেকে গঙ্গার তলদেশ পর্যন্ত একটা বিরাট সুড়ঙ্গ দিয়ে সেই জলনিকাশের ব্যবস্থা পাকা হলো।

আজও সেই ব্যবস্থা ইঞ্জিনীয়ারদের বিস্ময় উদ্রেক করে—তাঁর কর্মকৌশলের নিপুণতা প্রমাণ করে। তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো ঔরঙ্গজীবের মসজিদের উচ্চচূড়ায়—চঞ্চল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাতে যার ভিত্তিমূল কম্পমান।

১৬৫১ সাল। দিল্লীর শাহেনশা ঔরঙ্গজীব তাঁর বারাণসী ফর্মান জারী করলেন। তাতে বল্লেন নতুন মন্দির কোথাও গড়া চলবেনা কিন্তু পুরোনো মন্দিরও ভাঙ্গা হবে না। দশ বছর পরে ১৬৬৯ নতুন ফর্মান জারী হলো ভাঙ্গা মন্দির—বিধর্মীদের ধর্ম দমন করো—সেই ফর্মান চলে গেল প্রদেশে প্রদেশে—সোমনাথ, বিশ্বনাথ, মথুরার কেশব দেবের মন্দির সেই ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তারপর একদিন দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজীবের নামে মসজিদ উঠলো গঙ্গার তীরে। তার সুউচ্চ মিনার সহরের উপর ভ্রূকুটি বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুকাল। সেই অভ্রভেদী মিনারের উচ্চতা ছিল যত, গভীরতা তত ছিলনা—অবিশ্রাম জলধারার আঘাতে ভারসাম্য চ্যুত হতে আর দেরী নেই। "The lofty minarets of the Musjid of Aurangzib, the foundations of which, from proximity to the encroaching river, were giving way, so as to threaten danger to bathers and destruction to neighbouring houses."

সেই ভগ্নপ্রায় মিনারগুলির ভিত্তিতে শক্তি জোগালেন প্রিন্সেপ। তারা যে আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে অতীত গৌরব ঘোষণা কচ্ছে তার জন্যে প্রিন্সেপের দায়িত্ব কম নয়।

সুযোগ যখন আসে তখন এমনি করেই আসে। পাটনীমল নামে এক ধনী ভবিষ্যতের সুনাম বা পুণ্যের আশাতেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক কর্মনাশার উপরে এক সেতু বাঁধতে চাইলেন। লক্ষাধিক মুদ্রোর ব্যয়ভার তিনিই বহন করলেন। সে সেতু আজ পথিকের চলা সহজ করেছে কর্মনাশার বুকের উপর। জেমস প্রিন্সেপের আর এক কীর্তি।

সহরকে সুন্দর করার কিছু কাজ পেয়ে খুসী হলো তাঁর ভিতরকার শিল্পীটা। এবার বৈজ্ঞানিকের কাজ সুরু হলো। বারাণসীর বেসরকারী আদমসুমারী প্রথম করলেন প্রিন্সেপ। পথঘাট, মন্দির মসজিদ, নদীতটের ছবি আঁকলেন। লোক গণনা করে তার শ্রেণী বিভাগ করলেন। এত নিখুঁত গণনা ইতিপূর্ব ভারতে আর হয়নি। পরবর্তীকালের গেজেটিয়ারে স্বীকার করা হচ্ছে various estimates were made from time to time of the population of the city of Benares, and notably that of the Prinsep about 1826.

১৮৩০ সালে বারাণসীর মিন্ট উঠে গেল। দশ বছর এই প্রাচীন সহরে বাস করে তিনি

তার পথে ঘাটে, গৃহে, সেতুতে মসজিদে গীর্জায় নিজের কৃতকর্মের স্বাক্ষর রেখে গেলেন।

কিন্তু যে কারণে জেমস প্রিন্সেপের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে বসেছি তার কিছুই এখনো তো বলা হলো না। এতো শুধু কর্মপাগল এক আপন ভোলা যুবকের কাহিনী—দূর বিদেশে দশটি বছর যার মুদ্রা প্রস্তুত করে আর সহর সাজানোর কাজে কেটেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে জেমস প্রিন্সেপের নাম যে কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার কথা এবার সুরু হলো। কলকাতায় ফিরে এসে আবার সঙ্গ পেলেন পণ্ডিতপ্রবর হোরেস হেম্যান উইলসনের। সেই সূত্রে এলেন এসিয়াটিক সোসাইটিতে, সৈন্যদলের মেজর হার্বার্ট নামে এক সেনাধ্যক্ষের সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছিল।

সৈন্যদলে কাজ করলেও হার্বার্ট সাহেব আর দশজনের মত সিপাহী বনে যাননি। বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁর ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা। ভারতবর্ষের প্রতি ছিল অনুরাগ।

তিনি ঠিক করলেন একটি পত্রিকা বার করবেন যার মধ্য দিয়ে ভারতের শিল্পসমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কোন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে পৌঁছে দেওয়া যায়। হার্বার্ট সেই উদ্দেশ্য নিয়ে Gleanings in Science পত্রিকা বার করলেন। সেই পত্রিকায় গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রিন্সেপ লিখলেন।

অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই কার্যোপলক্ষে হার্বার্ট গেলেন অযোধ্যায়। কাগজের দায় প্রিন্সেপের ঘাড়ে চেহারা বদলে ফেললেন কাগজের। তাঁর হাতের নিপুণ শিল্পে শোভিত হয়ে, ভারতের সকল চিন্তাশীল লোকের লেখা জোগাড় করে কাগজের শুধু গৌরবই বাড়ালেন না, বিক্রীও বাড়ালেন। আয় বাড়লো, খ্যাতি বাড়লো, প্রিন্সেপের উদ্যমে কাগজের অগ্রগতি সমানে চলতে লাগলো "until it was brought at last to such a condition as to rival publications of the same character in Europe."

১৮৩২ সালে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন ভারত ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি তখন সুদূর ইংলণ্ডে পৌঁছে গেছে। বোডেন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদে আহ্বান জানালো। সে আহ্বান তিনি ফেরাতে পারলেন না।

ভারতবর্ষের অন্তরের বাণীকে সাধনার দ্বারা জেনেছিলেন—সেই বাণী নিজের দেশে পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি চলে গেলেন। পিছনে রেখে গেলেন তারই শিষ্যস্থানীয় প্রিন্সেপকে।

উইলসন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্সেপের একসঙ্গে বহু কাজ বাড়লো। চাকরীর ক্ষেত্রে উইলসনের শূন্যপদ যেমন তাঁকে পূর্ণ করতে হলো, বাইরের সমাজ জীবনেও তাঁর কাজ উইলসনের ধারা সম্পূর্ণ করলো।

এসিয়াটিক সোসাইটির বহু দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিলেন। তাঁর gleanings তুলে দিলেন না কিন্তু সেই পত্রিকাকে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে পরিণত করলেন।

স্যার উইলিয়ম জোন্স, চার্লস উইলকিন্স, কোলব্রুক উইলসন প্রভৃতি মনীষীর চেষ্টায় ভারতীয় পুরাতত্ত্বের নানা দিক তখন আলোচনার জন্য খুলে গেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব তাঁদের সন্ধানীর চোখে ধরা না পড়ে পারেনি।

তাঁদের কাজের একটি সূত্র প্রিন্সেপ তুলে নিলেন।

প্রাচীন লিপি উদ্ধারই হলো তাঁর কাজ। অতীতের ভারতবর্ষ তার বাণী রেখে গেছে ভবিষ্যৎ কালের জন্য। পাহাড়ে পর্বতে মন্দির গাত্রে, মুদ্রায় লুকিয়ে আছে তার ইতিহাস অজানা লিপির আড়ালে।

ভারতের নানা দেশ থেকে তাঁর কাছে লিপি আসতে লাগলো পর্বত গাত্র কেটে শিলা-লিপি তুলে আনা হলো, ভগ্নাবশেষ প্রাসাদের সিংহদ্বারে উৎকীর্ণ লিপি, ভূমিদানের তাম্রলিপি তাঁর কাছে আসতে লাগলো পাঠোদ্ধারের জন্য। গভীর অভিনিবেশ সহকারে কাজে লাগলেন প্রিন্সেপ। সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য খুব প্রগাঢ় ছিলনা। তবু এই কাজে তাঁর অদম্য উৎসাহ, গভীর সাধনা তাঁর ঈপ্সিত ফললাভে সহায়তা করলো।

লিপি পাঠের এই দুরূহ কর্মে প্রিন্সেপের কৃতিত্ব ছাপিয়ে গেল তাঁর দুর্ধর্ষ পূর্ব-সূরীদের। দিল্লী এলাহাবাদের স্তম্ভ লিপির মর্মোদ্ধার করতে পারেন নি জোন্স, কোলব্রুক এবং উইলসনের মত মহাপণ্ডিতেরা। যে পথ তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছে সে পথে পা বাড়াতে প্রিন্সেপ ভীত হলেন না। সেই লিপির অর্থ তাঁরই কাছে ধরা পড়লো। তারপর সেই লিপির সঙ্গে গুজরাটে গির্ণার লিপি, কটকের পউলি লিপির যোগসূত্র খুঁজে বার করলেন।

গির্ণার লিপি পাঠ করে, তার অর্থউদ্ধার করে জেমস প্রিন্সেপ চিরস্মরণীয় হয়েছেন। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে যে যে বাণী প্রিয়দর্শী অশোকের সেই বাণী এক বিদেশী পান্থ আমাদের কাছে পৌঁছে দিলেন।

আশ্চর্য হয়ে তিনি লক্ষ করলেন যে দিল্লি এলাহাবাদের স্তম্ভ লিপির সাদৃশ্য আর গির্ণার ও পউলির বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য। তিনি বুঝলেন এগুলি Series of edicts promulgated by Asoka. গির্ণার লিপিতে তিনি গ্রীক নরপতি অ্যান্টিওকাসের উল্লেখ পেলেন, এবং ইজিপ্টের টলেমীর উল্লেখ পেলেন। গ্রীক নরপতি অ্যান্টিওকাস আশোকের বন্ধু ছিলেন।

অ্যান্টিওকাস, সিরিয়াক গ্রীক নরপতি—তাঁর উল্লেখ অশোকের লিপিতে কেমন করে এল। দূর সিন্ধুপারের ঐ নরপতির কথা জানবার কি উপায় অশোকের ছিল। এর উত্তর দিলেন প্রিন্সেপ, অশোকের যে মহিমা সম্বন্ধে মন সংশয়াচ্ছন্ন ছিল কারো কারো তাদের দ্বিধা ঘুচিয়ে জোরের সঙ্গে প্রিন্সেপ বললেন— "I am now about to produce evidence that Asokas acquaintance with geography was not limited to Asia, and that his expansive benevolence towards living creatures extended, at least in intention to another quarter of the globe;—that his religions ambition sought to apostolize Egypt."

লিপি উদ্ধৃত করে দেখালেন—"এখানে ও বিদেশে, যেখানে তাঁর ধর্ম পৌঁচেছে সেখানেই দেবানাপিয়ের ধর্ম চলছে।" আর একটি তর্কের নিরসন করলেন প্রিন্সেপ। টার্ণার প্রথম প্রিয়দর্শী আর অশোককে একই লোক বলে ঘোষণা করলেন। সে কথা মানলেন না অনেকে। সাধারণ লোক না মানলে কিছুই ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু উইলসন সাহেব বল্লেন যে অশোকই যে প্রিয়দর্শী এর তো কোন প্রমাণ নেই।

উইলসন সাহেব যুক্তি দেখালেন যে গির্ণার বা পউলির কোন লিপিতেই বুদ্ধ বা বৌদ্ধ-ধর্মের কোন উল্লেখ নেই সুতরাং এ রাজার ধর্মমত কি, এরা বুদ্ধের ভক্ত কিনা তা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অশোকই যে প্রিয়দর্শী তা কে বলবে।

প্রিন্সেপ লিখলেন— "We may stop short of absolute and definite proof that Asoka emenciated his edicts under the designation of Priyadasi the beloved of the Gods," but all legitimate induction tends to justifythe association which is contested by no other inquier.

টার্ণার, লাসেন, বুর্ণফ, কানিংহাম, মুলার প্রভৃতি পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকেরা তখন এক-

বাক্যে স্বীকার করেছেন যে অশোক আর প্রিয়দর্শী একই লোক।

শুধু ভারতের ইতিহাসে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটী নতুন পাতার সন্ধান পাওয়া গেল। যে ভারতীয় সভ্যতার গর্বে উৎফুল্ল হয়ে আজ আমরা শতকণ্ঠ; যার মহিমায় পাশ্চাত্যের জড়বাদের প্রতি আমাদের উন্মাসিক ঘৃণার শেষ নেই সেই সভ্যতার পুনরুদ্ধারের প্রধান চেষ্টাটা ঐ জড়বাদী পাশ্চাত্যের কয়েকটি দুঃসাহসী মানব সন্তানের। বিস্মৃতির মোহজাল লুপ্ত করে রেখেছিল যে মহৎ প্রাণের উদার প্রচেষ্টাকে তাকে বিশ্বের সকলের কাছে উদ্ঘাটিত করলেন মুদ্রাবিশেষজ্ঞ জেমস প্রিন্সেপ।

"অশোকের সেই মহাবাণী কত শত বৎসর মানব হৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগদিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিলনা। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্রদ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই—তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল, তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী দ্রুবিদগণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তর স্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন"

১৮৩২ থেকে '৩৮ জেমস প্রিন্সেপ এই কাজে মেতে রইলেন। মধ্য এশিয়ার নানা জায়গায় তখন য়ুরোপের ঘর ছাড়া পথিকের দল বেরিয়ে পড়েছে। তাদের পথ চেয়ে বুঝি বসেছিল ইতিহাস—কত মরা গ্রামের কঙ্কাল খুঁজে পেলো তারা, মাটির বুক চিরে উদ্ধার করলো পূর্বকথা, পেলো প্রাচীন সভ্যতার বার্তাবাহী মুদ্রা।

সেই সব মুদ্রা কলকাতায় চলে এলো।

তার অর্থ উদ্ধারের কাজ প্রিন্সেপ ছাড়া আর কেই বা করে। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে মুদ্রার ছবি আর পরিচয় বেরুলো অসংখ্য। মূক অতীতের মুখরতা শুধু জেমস প্রিন্সেপের কাছেই ধরা পড়লো।

কিন্তু যা অনিবার্য তা ঘটলো বড় তাড়াতাড়ি। প্রচণ্ড প্রাণচালা পরিশ্রমে দেহ ভেঙ্গে পড়লো। অসুস্থতা হঠাৎ একদিন প্রবলদর্পে শরীরকে আচ্ছন্ন করলো।

মস্তিষ্কের গোলযোগ বলে সন্দেহ করলেন চিকিৎসকেরা। বন্ধু ও আত্মীয়েরা ১৮৩৮-এর অক্টোবর মাসে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন—সুচিকিৎসা ও বিশ্রামের আশায়। মাত্র একটি বছর কোন রকমে কাটলো, তারপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দীপ্তি নিভে গেল একদিন ২২শে এপ্রিল ১৮৪০।

প্রায় বিশ বছর বয়সে এসেছিলেন—আর বিশ বছর প্রায় রইলেন ভারতে। সহজ আনন্দে, উজ্জ্বল মত্ততায় নারীসম্ভোগের অবাধ সংযোগ গ্রহণে দিন কাটতে পারতো যা তখনকার অনেক বিদেশীরই কেটেছে। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধানে বিজ্ঞানীমন আর সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষের এক নতুন পরিচয় তিনি পৃথিবীর কাছে দিয়ে গেলেন। ১৮৩৫-এ তিনি বেঙ্গল আর্মির কর্ণেল অবটের মেয়েকে বিয়ে করেন—তাঁর নাম হ্যারিয়েট। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনের ধারাবাহিকতা রাখতে গিয়ে এই তথ্যটাই দিতে ভুলেছি। একটি শিশু কন্যাও তাঁদের ছিল।

যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ কর্চ্ছে যে কোন প্রকার দীনতা, সংকীর্ণতা, মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সংসারে যাঁরা তার চেয়ে অল্প অধিকার পেয়েছে তাদের

জন্য তাঁর সমবেদনার শেষ ছিল না। নিজের ত্রুটি স্বীকারে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হতোনা। অন্যের কৃতিত্বে তাঁর মুখে যে আনন্দের আভা দেখা দিতো তার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না একটুও।

১৮০০ সালে ডঃর ক্যালকনার প্রিন্সেপ সম্বন্ধে লিখছেন, "Never was a mind more free from the paltry and mean jealousies which sometimes beset scientific men."

গঙ্গার তীরে বিদেশী জাহাজ যেখানে এসে নোঙ্গর ফেলতো, যেখানে ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করতো অন্য দেশের মানুষ সেখানে তাঁর স্মরণে তৈরী হলো প্রিন্সেপ ঘাট। ভারতের ইতিহাসে অশোকালিপির সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে রইলো তারই নামাঙ্কিত ঘাটে নামবে বিদেশের মানুষ। তারা জানবে এক বিদেশী এই দেশের পুরোনো ইতিহাসের ধারা সন্ধান করে এদেশের ভালবাসা পেয়েছেন—আর জানবে এই ভারতবর্ষের মহাতীর্থে, তার শ্যামল প্রান্তের আর দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের নীলিমার নীচে, কলপ্রবাহিনী ভাগীরথীর তীরে তীরে তাদের চিরকালের নিমন্ত্রণ আছে। এখানে শুধু অন্যতরীর আনাগোনা নয় মানুষের হৃদয় এখানে ঘাটে ঘাটে ঘুরছে মানুষকে জানবার জন্য।

আজ যখন বিদেশীদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি নির্বিচার হয়ে উঠছে—সরকারী দপ্তর-খানার ভারী বুটওলা সাহেবের স্মৃতি যখন আর সব ছাড়িয়ে উঠছে তখনই মনের মধ্যে সেই অনন্তর চল্লিশ সতাসন্ধানীর ছবি কল্পনা করে নিই।

যখন সমস্যা কণ্টকিত জরাজীর্ণ মানুষ নিজের মধ্যে নানা খণ্ড বিভেদের বেড়া তুলছে তখন গঙ্গাতীরে ঐ ঘাটের নীচে অস্তোন্মুখ সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাই প্রিয়দর্শীর সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে থাক—ক্ষণকালের বিভ্রান্তি ছাপিয়ে আমাদের প্রণাম তোমার কাছে পৌঁছুক।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষক কালিদাস

ব্রহ্মচারিণী বাসনা

এই পৃথিবীকে আমরা ভালবাসি, কেবলমাত্র এজন্য নয় যে, এর থেকে আমাদের প্রয়োজন সাধ্য হয়। কিন্তু এর রঙে, রূপে, রসে আমরা সঞ্জীবিত। পঞ্চভূতের অপূর্ব সংমিশ্রণে গড়া এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ। বিশ্বের সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ অচ্ছেদ্য। তাই মানুষ, পশুপাখী, নদী-পর্বত, বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, বিচিত্র ঋতু সকলেই সেই অসীম নভতল ও বিস্তীর্ণ সমতল—এই দুই অনন্তের মাঝে স্থান পেয়েছে। এবং অকৃপণ প্রকৃতি ঋতুবৈচিত্র্যের বর্ণাঢ্য সম্ভারে প্রতিনিয়তই পৃথিবীকে সুসমৃদ্ধ করে তুলছে। আকাশের নীলিমা ও মৃত্তিকার শ্যামলিমা—এই দু'খানি উন্মীলিত পত্রের বুকে বিভিন্ন ঋতু এঁকে যাচ্ছে কত অপূর্ব আলিম্পন। গ্রীষ্ম আসে তার প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে— শুষ্ক করে দেয় মৃত্তিকার সরস বক্ষ। নিদাঘের নিষ্করুণ রূপ কবির লেখনীতে রূপায়িত হয় —

পটুতরদবদাহোচ্ছুষ্ক শষ্পপ্ররোহাঃ,
পরুষ পবন বেগোৎক্ষিপ্ত সংশুষ্কপর্ণাঃ।
দিনকর পরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাৎ
বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষমাণা বনান্তাঃ ॥

প্রচণ্ড দাবাগ্নি উত্থিত হয়ে শুষ্ক তৃণাঙ্কুর দগ্ধ করছে— প্রবল বায়ুবেগে শুষ্ক পত্রগুলি চারি-দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, সূর্যতাপে জলাশয়ের জল শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং বনস্থলীর চারিদিকে নিরীক্ষণ করলে মহাভীতির সঞ্চার হচ্ছে। প্রকৃতির এই নীরস রূপের মাঝে কবি সরসতার সুর এনে দিয়েছেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সন্তাপে কী সুখকর হয়?—

সুভগ সলিলাবগাহাঃ পাটল সংসর্গ সুরভিবনবাতাঃ
প্রচ্ছায় সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ।

শীতল জলে অবগাহন গ্রীষ্মকালে সুখপ্রদ, তার সঙ্গে পাটল ফুলের সৌরভে আমোদিত মলয়া-নিল তাপদাহন দূর করে তার পেলবস্পর্শে, আর ছায়াপ্রধান স্থানে সুলভ নিদ্রা এবং দিবসের শেষে গোধূলির আগমন রমণীয় হয়ে ওঠে।—কিন্তু শুধুই কি শুষ্ক করে দেয়?— দান করে না কি কিছু? বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে দিয়ে যায় রুক্ষ বৈরাগী পৃথিবীকে সরস করে তুলবার জন্য সজলজলদ শ্রেণীর সম্ভার। আসে বর্ষা— শিখী পুচ্ছে শিহরণ জাগিয়ে, বিরহীর হৃদয়তন্ত্রীতে ব্যথার সুর বাজিয়ে। পৃথিবী হয়ে ওঠে সজল, শ্যামল। ধীরে ধীরে শ্যামলতা গাঢ়তর হয়ে ওঠে। কবির কাছে এ ঋতুর সমাদর বড় অপরূপ। বিশ্বের চিরবিরহ বেদনার অশ্রু উৎস যেন খুলে যায় এই ঋতুর আগমনী সুরে। কবি সেই সুরে আপন গীতি মিলিয়ে নেন—

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমন্তাৎ
পবন চলিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।

হাসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং
নবসলিলনিষেকাচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ ॥

নবজলসিঞ্চনে বনভূমির তাপ বিদূরিত হয়েছে। কদম্ব-কুসুম বিকশিত হওয়াতে মনে হচ্ছে যেন বনভূমি হর্ষভরে রোমাঞ্চিত হয়েছে—তরুশাখা সমীরণ সঞ্চালিত হওয়াতে মনে হচ্ছে—বনানী আনন্দভরে নৃত্য করছে এবং কেতকীকুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে সমস্ত বনস্থলী যেন মধুর হাসিতে ভরে উঠেছে।

তারপর এলো শরৎ—আশা, আনন্দ ও যশীর আলোক ছড়িয়ে। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে তার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। কবি যে চোখে দেখেন এই ঋতুকে তার দৃষ্টিমাধুরী ছড়িয়ে পড়ে লীলায়িত ছন্দে।

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞ বক্ত্রা
সোন্মাদ হংসরব নূপুরনাদরম্যা
আপক্বশালি রুচিরা তনুগাত্রযষ্ঠিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা
কাশৈর্মহী শিশির দীধিতিনা রজন্যো
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুসুমৈঃ সরাংসি
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ
শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥

ক্রমে শরতও আসে ফুরিয়ে দিগ্বধূদের লীলাচঞ্চল আননে সূক্ষ্ম কুয়াশার আবরণ টেনে—প্রকৃতির সিংহাসনখানি হেমন্তকে ছেড়ে দিয়ে যায়। মেঘমুক্ত দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশে হেমন্তের প্রবীণ সূর্য বহুদর্শীর কটাক্ষ হেনে যেন পৃথিবীকে সমাহিত করে তোলে—উছলা, চপলা প্রকৃতির সব কিছুই যেন পরিণতির প্রতীক্ষায় রত। তারপর পূর্ণ পরিণতির শীত ঋতুর আগমনবার্তা দিকে দিকে ধ্বনিত হয়। বিচিত্র লীলাক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার আগে শরৎই কি নৈরাশ্যের ডালি রেখে যায় শীত? নৈরাশ্যের বহিরাবরণের অন্তরে সুপ্ত থাকে আশার বীজ—নবসন্তের সূচনা। গন্ধে-গানে, রূপে-রসে সঞ্জীবিত করে নবীনতার সতেজ ছোঁয়াচ নিয়ে বসন্ত আসে— ঋতুর জয়-তিলক তারই ললাটে শোভা পায়— কবি আখ্যা দেন ঋতুরাজরূপে।

নানামনোজ্ঞকুসুমদ্রুমভূষিতান্তান্
হৃষ্টান্যপুষ্টনিনাদাকুলসানুদেশান্
সমদমধুকরানাং কোকিলানাং চ নাদৈঃ
কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যৈঃ ॥

সঞ্জীবতা, সক্রিয়তা ও নবীনতার চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই যে ঋতুচক্রের আবর্তন, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে পটভূমিকার নিয়ত পরিবর্তন—এরই মাঝে নিহিত আছে সৃষ্টির অপূর্ব লীলাবৈচিত্র্য। সকলেই আসে যায়—একটা গভীর স্পর্শ দিয়ে যায় কিন্তু চিরন্তন ঠাঁই কখনও নেয় না। সৃষ্টিপ্রবাহের এই মূল রহস্য। তাই চেতনাচেতন নির্বিশেষে সমস্ত বস্তুজগতের কাছে এর একটা আবেদন আছে। বস্তুজগৎও নিষ্ক্রিয় থাকে না তার মধ্যেও বিকশিত হয় প্রাণস্পন্দন।

দরদী কবি কালিদাস তাঁর অতুলনীয় সাহিত্যভাণ্ডারে রেখে গেছেন এই বিকাশেরই প্রতিলিপি। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির এই উন্মুক্ত পত্র দুটী সুগভীরভাবে পাঠ করেছেন এবং অনুভব করেছেন তার প্রতিটি স্পন্দন। তাই তাঁর সাহিত্যে বিশ্বচরাচরের প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী শক্তির প্রকাশ হয়েছে। সে দৃষ্টি নীরস পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিচারিত না হয়ে সরস চিত্তের মাধুরিমায় তাঁর সৃষ্টিকে করে তুলেছে অদ্বিতীয়, অনুপম, অপরাজেয়।

কবির মনের মুকুরে দুটী চিত্রপট অঙ্কিত হয়েছে—একটি প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য আর একটি মানবচরিত্র। মানবচিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কবির কাব্যসঙ্গীতের প্রতিটি ছন্দে ফুটে উঠেছে। উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব অপরিহার্য। বহির্বিশ্বের সকল সুর প্রতিনিয়ত মানুষের মনোবীণায় অনুরণন তুলেছে। কবির চিত্তে সেই অনুরণন অমররূপ পরিগ্রহ করেছে। লেখনীর মূর্চ্ছনায় কবি তাকে চিরকালের জন্য অক্ষয় করে রেখে গেছেন।

কালিদাসের সৃজনী প্রতিভাকে দুভাগে ভাগ করা যায়—কাব্য ও নাটক। মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার এই কাব্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মালবিকাগ্নিমিত্রম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ও বিক্রমোর্বশী প্রসিদ্ধ নাটকের স্থান গ্রহণ করেছে। কালিদাসের পর্যবেক্ষণক্রিয়া তিনটী স্রোতধারায় প্রবাহিত হয়েছে। বিচিত্র ঋতুর অপূর্ব বর্ণনায় প্রথম ধারা সঞ্জীবিত হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে সাগর, ভূধর, নদীজলধারা বনস্থলীর নিভৃত কানন, বৃক্ষলতাগুল্মের সুসমসম্ভার দ্বিতীয় ধারাকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। তারপর প্রকৃতির প্রভাব মানব মনের গহন গভীরে যে সাড়া জাগিয়েছে তাতেই তৃতীয় ধারা কল্লোলিত হয়ে উঠেছে। এই ত্রিধারা কবির মনে তিনটী মহলের সৃষ্টি করেছে—বাণী, চিত্র, গীতি। ঋতুবর্ণনায় ও মেঘদূত রচনায় কবির বাণীমহল মুখরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বাণী মহল ধীরে ধীরে চিত্র মহলে আসন নিয়ে নেয়। মেঘদূতের কবিকে যখন কল্পনা করি তখন দেখি কবির অনুসন্ধানী মন যেন ভারতের মানচিত্রখানি খুলে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন। কিন্তু সে কল্পনা ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়ে ওঠে চিত্রে। মেঘদূতকে নিয়ে কবির সংযত লেখনী উড়ে চলেছে ভৌগলিকের সঙ্গে সমান্তরাল পথে। কল্পনা ও বাস্তবের অপূর্ব মিশ্রণে, সাবলীলগতির ব্যঞ্জনায় বিচিত্র তরঙ্গ তুলে মুগ্ধ পাঠককে যেন এক অভিনব চিত্রশালায় এনে উপস্থিত করে দেন সেই গবেষক কবি।

চিত্রমহলের সুগভীর রেখা অঙ্কিত হলো—রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে—শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে লঙ্কা থেকে ফিরে আসছেন বিমানপথে ভূপৃষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে মন্দাকিনীর শোভা দেখাচ্ছেন এবং গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলের বর্ণনা করছেন—

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূর্মেঃ
ঋচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব

প্রকৃতিও মানবের মধুর কলগান বেজে উঠেছে কালিদাসের নাটকের মধ্যে। অভিজ্ঞানশকুন্তলার

চতুর্থ সর্গে পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে আশ্রম আবেষ্টনীর সঙ্গে শকুন্তলার মধুর সম্বন্ধ ফুটে উঠেছে। তরু-লতা, মৃগ-পক্ষী সকলের কাছেই শকুন্তলা অনুমতিপ্রার্থী হয়েছেন। অতি শৈশব থেকে তাদের সঙ্গে যে নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে আজ বিরহব্যথায় তারাও ব্যাকুল।

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসব
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে রাজা অগ্নিমিত্র বয়স্য বিদূষকের সঙ্গে বসন্তের সুখস্পর্শ তিনি কেমন করে অনুভব করছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন কবি কালিদাস—

অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভিদক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন।

বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা উর্বশীকে হারিয়ে এমন বিহ্বল হয়েছেন যে বনস্থলীর সর্বত্র তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং বৃক্ষলতা, পর্বত, পশু, পক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মত আচরণ করছেন। তাদের কাছে উর্বশীর সংবাদ নিচ্ছেন—ধারাসম্পাতে সিক্ত উপলখণ্ডে বসে ময়ূর কেকারব করতে করতে মেঘমালার দিকে দৃষ্টিপাত করছে—প্রবল বায়ুবেগে তার পুচ্ছ আন্দোলিত। রাজা তাকেই উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন—

হে নীলকণ্ঠ, তুমি যদি উর্বশীকে দেখে থাক তবে আমাকে বল—তার গতি হংসের মত আর মুখমণ্ডল চন্দ্রের শোভাকেও ম্লান করে।

এই ভাবে আমরা দেখতে পাই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি বস্তুর প্রতি কালিদাসের পর্যবেক্ষণ সুপরিস্ফুট। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারা রূপায়িত, সহানুভূতিসিক্ত লেখনীর মাধ্যমে কালিদাস যে সাহিত্য পরিবেশন করেছেন—বিশ্বের সাহিত্যভাণ্ডারে তা অনবদ্য অবদানরূপে চিরদিন সমাদর লাভ করে এসেছে ও আসবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গ

রণেন্দ্রনাথ দেব

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যানভাগ এত চমৎকারিত্বপূর্ণ যে প্রথমে তার একটি সারমর্ম দেওয়া ভালো।

সমগ্র কাব্যটি জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, যমুনা, কালিয়দমন, হার, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ এই কটি খণ্ডে বিভক্ত। জন্মখণ্ডে কৃষ্ণের আবির্ভাবের দৈবকারণ প্রদর্শিত হয়েছে। একদা দেবতারা হরির (নারায়ণ) কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন কংসের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে। হরি স্বীকৃত হলেন। দুগাছি সাদা ও কালো কেশ দিয়ে বললেন বসুদেব ও দৈবকীর দুটি সন্তান হবে হলী (বলরাম) ও বনমালী। বনমালী কংসের বিনাশ সাধন করবেন। কংস একথা জানতে পেরে বন্দীকৃত বসুদেব-দৈবকীর সন্তানদের বিনাশ সাধন করতে থাকেন। একে একে ছয়টি শিশু এভাবে নিহত হবার পর সপ্তম গর্ভের সন্তান বলরাম রোহিণীর গর্ভে গিয়ে আশ্রয়লাভ করেন। অষ্টম গর্ভের সন্তান বনমালী জন্মাবার পর জগৎ মায়াদ্বারা আবৃত হলো। বসুদেব নদী পার হয়ে নন্দের গৃহে শিশুকৃষ্ণকে রেখে তাঁদের নবজাত কন্যাকে নিয়ে ফিরে আসেন। কংস এই কন্যাকেও হত্যা করলেন বটে কিন্তু অচিরেই জানতে পেলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। কৃষ্ণ গোপকুলে বড় হতে লাগলেন। দেবতাদের অনুরোধে স্বয়ং লক্ষ্মী রাধারূপে জন্ম নিলেন সাগর গোয়ালার ঘরে। পুরাণের অনুসরণে কৃষ্ণের জন্মকথা এই পর্যন্ত বর্ণনা করে কবি যখনকার কথা বলতে শুরু করলেন কৃষ্ণ তখন পূর্ণ কিশোর।

রাধা নপুংসক আইহনের পত্নী। আইহন কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে বৃদ্ধা বড়ায়ি রাধার তত্ত্বাবধান করে। একদা কৃষ্ণ বড়ায়ির মারফৎ রাধার কাছে গুয়াপান, কর্পূর ও চম্পকফুল পাঠালেন প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ। রাধা কুপিত হলেন তাতে। বড়ায়িকে বললেন

মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে
পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে নাক কানে।

ক্রুদ্ধ রাধার হাতে চড় খেয়ে বড়ায়ি অভিযোগ জানাল কৃষ্ণের কাছে। দুজনে স্থির করলেন এর শোধ নেওয়া হবে। একদিন বড়ায়ির পরামর্শে রাধা মথুরার হাটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দধি দুগ্ধের ভাণ্ড নিয়ে রওয়ানা হলে পথে কৃষ্ণ দানীরূপে তাঁর পথরোধ করলেন। কৃষ্ণের দানের পরিমাণ শুনে রাধা স্তম্ভিত। এগার বৎসর তাঁর বয়স, কৃষ্ণ তাঁর কাছে দান চেয়েছেন বারো বছরের। কৃষ্ণের আসল দাবী এও নয়, রাধার দেহ। রাধা প্রথমে ক্রোধ প্রকাশ করলেন, বললেন

পাঁজী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে।

এবং

ষোলশত গোয়ালিনী জাইএ বিকে হাটে
মাগুকিলে কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে।

আবার বিনীতভাবে উল্লেখ করলেন তাঁর অল্পবয়স প্রেমে অনভিজ্ঞতার কথা

ফলের নাঅ কাহ্নাঞি নাহি সহে ভরা।

কিন্তু এসকল যুক্তি কৃষ্ণের মনে রেখাপাত করেনি। তিনি বলে রাধার প্রেম আকর্ষণ করলেন, দেহসম্ভোগে তৃপ্ত হলেন। রাধা বলেছিলেন 'ইগুলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে' অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, ছোট ইগুলা মাছের লোভে কেন ব্রত নষ্ট করবে? রাধার কথাই সত্য হলো। কৃষ্ণ ছোট সুখের

আশায় বড় সুখকে ত্যাগ করলেন। নৌকাখণ্ডে পুনরায় কৃষ্ণ খেয়ানৌকার মাঝির ছলনায় রাধাকে সম্ভোগ করলেন।

ইতিমধ্যে রাধা নিজেও কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছেন কৃষ্ণের প্রতি। ভারখণ্ড ও ছত্রখণ্ডে তিনি অনেকটা স্বেচ্ছায় সম্মতি দিলেন মিলনে। বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড ও যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে বিহারে রত দেখা যায়। রাধার সঙ্গে তাঁর প্রেম গাঢ়তর হয়েছে। যমুনাবক্ষে জলকেলির পর হার খুঁজে না পেয়ে রাধা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণ ঠিক করলেন রাধাকে শাস্তি দেবেন। মদনের পুষ্পবাণ তিনি নিক্ষেপ করলেন রাধার প্রতি। রাধা মূর্চ্ছিত হলে কৃষ্ণের ভয়ের সীমা রইলো না। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে রাধার চেতনা ফিরে এলো।

এতদিনে কৃষ্ণ সচেতন হয়েছেন, জীবনে তাঁর বৃহত্তর কর্তব্য অসমাপ্ত রয়েছে। কংস নিধন হয়নি। কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করলেন। বিরহিণী রাধা আকুল হয়ে প্রতি রাত্রি ব্যর্থ প্রত্যাশায় কাটান। বড়ায়ির চেষ্টায় স্বল্পকালের জন্য তাঁদের পুনর্মিলন হল বটে, কিন্তু নিদ্রিত রাধাকে ফেলে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন চিরকালের জন্য।

সাধারণ কৃষ্ণলীলা কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পার্থক্য এত গুরুতর যে নিষ্ঠাবান বহু ভক্ত একে বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। অথচ এই কাব্যটি একদিন যে বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গ বলে স্বীকৃত হতো বহু কোষগ্রন্থে এ থেকে সংকলিত পদগুলিই তার প্রমাণ। যে কোনো কারণেই হোক এই কাব্যটি পরবর্তীকালে অনাদৃত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত বসন্ত রঞ্জন রায় বিশ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় এর পুঁথি আবিষ্কার করার পর আজ পর্যন্ত আর কোনো পুঁথি পাওয়া যায়নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল, ভাষা, লিপি প্রভৃতি বিষয়ে কোনো দুজন পণ্ডিত একমত নন। কিন্তু যেকালেরই লেখা হোক, ভাষা ও লিপি প্রাচীন কি অর্বাচীন যাই হোক, এর সাহিত্য-মূল্য বিশেষত আখ্যানরসের উৎকর্ষ যে অসাধারণ তা দেখানো বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। তার আগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৈষ্ণবমতবাদের কোন বিচিত্র রূপটি ধরা পড়েছে দেখানো যেতে পারে।

কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এনিয়ে পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণোপাসনার উদ্ভব, প্রবর্তনকাল ও প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে *আর, জি, ভাণ্ডারকর, *হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, *বাণীকান্ত কাকতি, শ্রীযুক্ত এ, ডি, পুশিলকর, অধ্যাপক জে, গণ্ডা প্রমুখ মনীষীদের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত এই যে কৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল ১০০০ থেকে ৯০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। কৃষ্ণ অসাধারণ শক্তিশালী হলেও মানুষই ছিলেন, ধীরে ধীরে দেবপদবীতে আরোহণ করেছেন। পুরাণের যুগে তিনি দেবতা বলে স্বীকৃতিলাভ করেন ও কালক্রমে এক ভক্তিরসাশ্রিত মতবাদের জনক হিসাবে তাঁর নাম ভারতের ঘরে ঘরে ছড়ায়।

বাংলাদেশে কবে থেকে বৈষ্ণব মতবাদ প্রবেশ করে তার কোনো ঐতিহাসিক সন তারিখ নেই। চৈতন্যযুগের বহুপূর্ব থেকে তা প্রচলিত ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কতখানি সংঘবদ্ধ ছিল তার রূপ বলা দুষ্কর। তবে, চতুর্থ শতকের শশুনিয়া-লিপি থেকে শুরু করে পঞ্চম-ষষ্ঠ-অষ্টক শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত লিপি ও পট্টসমূহে গোবিন্দস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী প্রভৃতি নামের বিস্তর উল্লেখ ও এঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দিরাদির কথা পাঠ করলে বুঝতে

পারি বৈষ্ণব আদর্শ ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব মতাদর্শ বাংলাদেশে চিরস্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল রয়েছে ভাগবতে। চৈতন্যদেব এসে ভাগবতকে সর্বপ্রধান আসন দিয়ে গেলেন বৈষ্ণবসমাজে। চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণব মতবাদে পৌরাণিক আদর্শের প্রভাব নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু পুরাণগুলিতে কোনো বিশেষ একটি মতবাদ প্রকীর্তিত হয়নি। এরা নিজেরাও নানা মতবাদের সমবায়ে সৃষ্ট। সর্বপ্রাচীন পুরাণ বায়ু থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু, কূর্ম, অগ্নি, পদ্ম, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি বহু পরাণে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে। অথচ সবগুলি পুরাণে একই কথা বলা হয়নি। এটি লক্ষণীয় যে প্রাচীন পুরাণগুলিতে কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রেমলীলা, তাঁর সহস্রাধিক পত্নী ও আঠারো হাজার সন্তানের কোনো উল্লেখ নেই (Aspects of Early Visnuism, P. 156 দ্রষ্টব্য)। এই সকল প্রেমোপাখ্যান নিশ্চয়ই পরবর্তীকালের যোজনা। হয়তো নিম্নবর্গীয় জনমানসে এর প্রথম স্ফুরণ ঘটে, পরে তা কৃষ্ণলীলার অঙ্গ হয়ে যায়। একেই একজন লেখক বলেছেন Folk-Krsnaism-এর প্রভাব।

সেকারণে বাংলাদেশে যে কৃষ্ণ এলেন তাঁরও দুইরূপ। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যভেদে তাঁর লীলা দ্বিবিধ। একরূপে তিনি 'মহাভারত নাটক সূত্রধার', অপররূপে 'গোপীশত কেলিকার'। এরমধ্যে মাধুর্যরসেরই প্রসার ঘটেছিল বেশি। মাধুর্যের ভিত্তি যৌন আবেগ। ভাগবত স্বয়ং এই ধরণের যৌন আবেগকে অতীন্দ্রিয় রসে রূপান্তরিত করেছিল। বাংলাদেশে তাই অতি সহজ অনেক লোকপ্রচলিত প্রেমোপাখ্যান কৃষ্ণের রমণ কাহিনী পর্যায়ে উন্নীত হলো। ভাগবতের প্রভাবে এই প্রবণতা বাড়া বই কমার সম্ভাবনা ছিলনা।

চৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে এমন কিছু কিছু ধ্যানধারণা প্রচলিত ছিল চৈতন্য নিজে যাদের বৈষ্ণব ভাবাদর্শের ভেতরে স্থান দিতে ব্যগ্র ছিলেন, একথা মনে করবার হেতু আছে। চৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিষয়ক সুবিখ্যাত আলোচনাটির কথা অনেকবার বলা হয়েছে। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে রায় রামানন্দকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সহজবৈষ্ণব'। চৈতন্য চরিতামৃতে দেখি রায় রামানন্দ ও রূপগোস্বামীর আলাপে

রায় কহে কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ
রূপ গোসাঁই কহে সাহজিক প্রেমধর্ম। অন্ত্য, ১।

এই 'সাহজিক প্রেমধর্ম' কি বস্তু? 'সহজ বৈষ্ণব' করা? তাঁরাই কি যাঁরা কখনো কখনো শাস্ত্র-বহির্ভূত পথে পদার্পণ করে এমন সব কথা মেনে নিয়েছেন যা পুরাণ সম্মত নয়? গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ববিশ্লেষণ করলে এমন কিছু জিনিষ পাই অন্যত্র অপ্রাপ্য। এগুলি সম্ভবত স্থানীয় উপাদান, এদেশের লোকমানস-সম্ভূত। বহু উপাখ্যান, বহু কিংবদন্তী যা নরনারীর সাধারণ লৌকিক প্রেমের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বৈষ্ণবকাহিনীতে পরে অভেদে মিশে গেছে। আরো পরেকার যুগে এরাই আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা লাভ করে উচ্চতর ধর্মসাধনার অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

বাংলা দেশে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে এজাতীয় অপৌরাণিক উপাদান পৌরাণিক কাহিনীর সমান্তরাল ধারায় বহমান। কৃষ্ণের জীবনকথার মধ্যে তাঁর প্রণয়কাহিনীগুলি কেন এদেশে প্রাধান্য লাভ করলো তার কোনো বিশেষ একটি কারণ নেই। তবে তন্ত্রধর্মের প্রসার এর অন্যতম হেতু নিশ্চয়ই। মধ্যযুগে বাংলা দেশে যে তন্ত্রাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল বৈষ্ণবসাধনা তার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। এই কারণেই বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা রাধার স্থান কৃষ্ণের চাইতে কোনো অংশে খর্ব নয়। রাধার নাম প্রাচীন কোনো পুরাণে পাইনা, অথচ বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্য রাধাময়। তন্ত্রের প্রভাবপুষ্ট জনমানসে যে শ্রেষ্ঠনারীকে ঘিরে অনেক উপাখ্যান জমে-

ছিল, রাধার মধ্যে তাদের পূর্ণ স্ফূর্তি অনুমান করে নিলে অসমীচীন হবেনা।

পৌরাণিক ও লৌকিক, কৃষ্ণকথার এই দুটি ধারা কি করে সংমিশ্রিত হচ্ছিল বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের কাছাকাছি সময় থেকে বাংলাদেশ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের কদর বেড়ে চলেছিল। ওড়িষ্যায় জগন্নাথদাস, সারল দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি; আসামে শঙ্করদেব, অনিরুদ্ধকায়স্থ গোপালচন্দ্র দ্বিজ, জয়রাম, কলাপচন্দ্র, বিষ্ণুভারতী, রত্নাকর মিশ্র, অনন্তকন্দলী, কেশবকায়স্থ প্রভৃতি ও বাংলায় মালাধর বসু, রঘুনাথ ভাগবতার্য প্রভৃতি কবিবৃন্দ পুরাণসমূহের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভাগবত এদের মধ্যে প্রধান ছিল, কিন্তু বিষ্ণু, কর্ম, অগ্নি, পদ্ম, বিশেষত হরিবংশও যে ব্যাপক ভাবে পঠিত হতো সন্দেহ নেই। মহাপ্রভুর প্রেরণায় বাংলায় ভাগবতের চর্চা বেড়ে যায়। তিনি স্বয়ং রঘুনাথ ভাগবতাচার্যকে ভাগবত অনুবাদে উৎসাহিত করেছিলেন এবং মহাপ্রভুর মৃত্যুর পরে রচিত বাংলা কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যগুলি উত্তরোত্তর শুধু পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল।

কিন্তু পুরাতন কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে শুধু পুরাণকথাই নয়, লোককথাও আছে। দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি অপৌরাণিক বিষয়বস্তু এদের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। পরবর্তীকালে যেসব গ্রন্থ স্পষ্টত ভাগবতকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যেও দানলীলার কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অপৌরাণিক শাখার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এর আখ্যায়িকাংশ পূর্বে দিয়েছি। কালের গতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বক্তব্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ভাগবতের প্রভাবে লৌকিক কাহিনীর ধারাটি হারিয়ে যাচ্ছিল, তবু একেবারে অবলুপ্ত হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তত একটি কাব্যে, দীন ভবানন্দের হরিবংশে, পুরাণসম্মত কৃষ্ণকথার বহিরাবরণ ভেদ করে লৌকিক আখ্যায়িকার স্রোত প্রবলবেগে উৎসারিত হয়েছে

বাংলাদেশে প্রচলিত পুরাতন এক লৌকিক কাহিনীর ছাপ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, একথা এখন প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এই তথ্যটির উল্লেখ করা হলো শুধু আলোচনার পূর্ণতার জন্য। আরো কিছু উদাহরণ দিয়ে মতটিকে আমরা স্পষ্টতর করতে পারি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি যে পুরাণগুলির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন তা নয়। জন্মখণ্ডে পুরাণকথার তিনি বিশদব্যবহার করেছেন। অন্যান্য পৌরাণিক আখ্যানের অভ্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়া গীতগোবিন্দের বহু শ্লোকের অনুবাদ আছে। তবু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে কোনো পুরাণ-এর আদর্শ নয়। তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড নৌকাখণ্ড, বাণখণ্ডের কবি পুরাণের বাইরে অন্য কোনো প্রেরণার কাছে ঋণী। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের বহুনামের উল্লেখ থাকলেও যে শ্যাম ও রাই নামে পদাবলীসাহিত্য শ্লাঘিত একাব্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। রাধা একাব্যে বৃষভাণুনন্দিনী নন, তিনি 'সাগর-কোঁঅরী'। তাঁর অষ্ট সখীর বদলে আছেন শুধু একজন সঙ্গিনী—বড়ায়ি। তাঁর স্বামীর নামও আয়ান নয়, আইহন। এসব লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্বসূচক। যেকালেই একাব্য লেখা হোক না কেন, বৈষ্ণব মতাদর্শের একটি খুব পুরোণো ধারার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যোগ যে নিবিড় ছিল তা অকুণ্ঠচিত্তে বলা চলে। এসমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গুরুত্ব যে বিশেষভাবে এর অপৌরাণিক আখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা এদেশে বদ্ধমূল হয়েছে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই বৈশিষ্ট্যের মূল্য কতটুকু? সত্যই কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একমাত্র

কাব্য যাতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মের লৌকিক ধারাটির বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয়েছে? অন্য কোনো কাব্যে কি আমরা এসমস্ত উপাখ্যানের সন্ধান পাই না? গভীরভাবে চিন্তা করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে খুব অসাধারণ কিংবা তুলনারহিত বলে মনে হয় না। যে গীতগোবিন্দ থেকে অনেক পদ অনুবাদিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাতে এই লৌকিক কাহিনীর স্ফুরণ অনেক আগেই ঘটেছিল। একজন লেখক মন্তব্য করেছেন 'the Gita-Govinda ... appears to be the first public utterance in dignified language of a Cult that must have been struggling for expression amongst the common people for ages,' (Visnuite myths and legends, p. 86) তাছাড়া, অনুরূপ আখ্যায়িকার আভাস বিদ্যাপতির কোনো কবিতায়ও পাওয়া যায়।

পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি বড় পার্থক্য এই যে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধা প্রথমাবধি কৃষ্ণগতপ্রাণা নন। কৃষ্ণ জোর করে তার প্রেম আকর্ষণ করেছেন। 'এগার বৎসরের বালী যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅকী' রাধাকৃষ্ণের পীড়ন থেকে যেভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন তা পদাবলীর তুলনায় অভিনব। কিন্তু নায়িকার এই বিমুখভাবটি বিদ্যাপতির পদেও আছে

কত অনুনয় অনুগত অনুবোধি মেলনমিলএ দেলহু হেম কোটি
পতিগ্রহ সখিহি সুতাওলি বোধি। বসন ঝপাব্র বদনধর গোএ
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ বাদরতর সসি বেকত ন হোএ।
ভাগলদল বহু লাবএ কোএ। ভুজজুগ চাঁপ জীব জোঁ সাঁচ
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি কুচ কণ্ডল কোরী ফল কাঁচ।

কত অনুনয় করে, কত সান্ত্বনা দিয়ে, অনুগত হয়ে সখিগণ নায়িকাকে স্বামিগৃহে শয়ন করালো, সে বিমুখ হয়ে শুয়ে রইলো। যে (সেনা-)দল পালিয়েছে কে তাদের ফেরাতে পারে? প্রিয় কামুক আর প্রিয়া অল্পবয়স্কা। কোটি সুবর্ণমুদ্রা দিলেও বালিকা মিলন চায় না, মুখ বস্ত্রে ঢেকে রাখে যেন মেঘের নিচে চন্দ্র। সোনার পয়োধর দুহাতে প্রাণের মতো রক্ষা করে। (মজুমদার ও মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী, ৫৯ সংখ্যক কবিতা)। তাম্বূলখণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অপর অভিনবত্ব। বিদ্যাপতির পদে এটিরও আভাস আছে—কত যতনে দূতী পঠাওল আনা আ গুয়া-পান (ঐ ৪ সংখ্যক)। নৌকালীলার কথাও পাই তাঁর পদে (ঐ ৩৫৯ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

পক্ষান্তরে, বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কিংবা পরবর্তীকালের আরো বহু কবির, যেমন মাধব আচার্য, দুঃখী শ্যামদাস, দৈবকীনন্দন সিংহ, পরশুরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে এবং গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির পদে দান-নৌকালীলার এমন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যা সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। সুতরাং কৃষ্ণসংক্রান্ত উপাখ্যানের লৌকিক শাখাটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া গেছে শুধু এই কারণে গ্রন্থটিকে মূল্যবান বিবেচনা করলে ভুল হবে। এই গৌরব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খুব বড় গৌরব নয়। তার যথার্থ মূল্য শিল্পগত উৎকর্ষে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রধান চরিত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি। এছাড়া একবার শুধু অল্পক্ষণের জন্য বলরামকে দেখা যায় ও আরেকবার যশোদাকে দেখি তিরস্কার করতে

বাছা সব বুলে কাহ্নাঞি নানা থানে থানে
তোহ্মে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে।

কিন্তু যশোদা কিংবা বলরাম প্রকৃত চরিত্রের পর্যায়ে পড়েন না। কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ির চরিত্র-বিকাশেই বড়ুচণ্ডীদাস সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছেন।

কৃষ্ণ একাব্যের নায়ক। কাহিনীর আদ্যন্ত তিনি উপস্থিত, তাঁকে কেন্দ্রকরে ঘটনাধারার আবর্তন। দুর্ভাগ্যবশত, তা সত্ত্বেও এত অন্তর্বিরোধ ও অসঙ্গতিতে পূর্ণ তাঁর চরিত্র যে তাঁকে নায়ক বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয়। তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ পৌরাণিক চরিত্রের বেশে, অথচ অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সে বেশ ছদ্মবেশ বলে সন্দেহ হতে থাকে। তাম্বুলখণ্ডে তাঁর মূর্তি এক অমার্জিত কামপরায়ণ গ্রাম্য যুবকের। কাহিনীর শেষ অবধি এই গ্রাম্যতা তাঁর চরিত্রে লিপ্ত হয়ে আছে। দানখণ্ডে তিনি যেভাবে রাধাকে সম্ভোগ করেছেন যে কোনো সুস্থ রুচিসম্পন্ন লোকের পক্ষে তা বিতৃষ্ণাকর। রাধার প্রেম তিনি দাবি করলেন, সে দাবির পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি শারীরিক বলের। রাধার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তাঁর যুক্তিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চধারণা হয় না। সর্বোপরি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ একজন নিকৃষ্টচেতা কাপুরুষ। বিশ্বজনের কাছে রাধা যখন পদস্খলিতা, কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে চলে এসেছেন। কংস-নিধনের উদ্দেশ্যে তিনি মথুরায় প্রস্থান করেছিলেন, কিন্তু কংসবধ মনে হয় উপলক্ষমাত্র। বাণখণ্ডে রাধার প্রতি তিনি বাণ নিক্ষেপ করা মাত্র রাধা হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন, কৃষ্ণ তখন অসহায়ের মতো ক্রন্দন করেছেন। এসমস্ত দেখে কোনো পাঠকের মনে যদি সংশয় জাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ কি কাহিনীর নায়ক, অথবা তিনি কি খল-চরিত্র মাত্র, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুত, এই বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তিটি শুধু ঘৃণ্য নন, হাস্যাস্পদও বটে। নিজের অপকর্মকে শাস্ত্রবচনের দ্বারা সমর্থনের হাস্যকর প্রয়াস করেছেন তিনি। তাঁর যুক্তির অন্তঃসার শূন্যতা দেখিয়ে রাধা তাঁকে মর্মান্তিক বিদ্রূপে বিদ্ধ করে বলেছেন

তোহ্মে রাখো আল জনে কড়া চারী কড়ী ধনে
আপনাক জানহ ঈশরে।

কিংবা

বিহা করিতেঁ না জুআএ হত তোহ্মে যোগী।

কৃষ্ণের চরিত্রে একটি গতিশীলতা ও প্রাণময়তা আছে সত্য, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণ চরিত্রের যে সমুন্নত আদর্শ বিরাজমান তার এই কালিমালিপ্ত বিকৃত প্রতিমূর্তিকে কোনো শিল্প-কলার অনুশাসনেই সমর্থন করা যায় না।

অপরপক্ষে, কৃষ্ণের তুলনায় রাধা চরিত্রের বিশিষ্টতা উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। তাঁর চরিত্রে প্রাণের ঐশ্বর্য, অনুভূতির গভীরতা ও জটিল মানসিক সংঘাত চমৎকার সংমিশ্রিত হয়েছে। জীবনের মৌলনীতির প্রশ্নে এই দুই চরিত্রের দুরকম প্রতিক্রিয়া থেকে তাঁদের স্বভাবগত পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একজন ইন্দ্রিয়কামনায় নিমগ্ন, আরেকজনের দেহে-মনে তার কোনো স্পর্শ নেই। এমনকি তাঁদের কথাবলার ভঙ্গিতেও এই পার্থক্য ছায়া ফেলেছে। কৃষ্ণ বারংবার সদম্ভে নিজেকে 'ত্রিদশের নাথ' বলে ঘোষণা করেছেন। রাধা একবারও স্বীকার করেননি তাঁর দেবত্ব। কৃষ্ণের উক্তি শুনে প্রতিবাদ করে রাধা বলেছেন

রাখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস।

রাধার এই স্বর্গবিমুখতা লক্ষণীয়, তিনি সত্যকার মর্ত্যনারী. of the earth earthly.

প্রথম দৃষ্টিতে রাধাকে কোমলাঙ্গী ও দুর্বল মনে হয়। তিনি 'শিরীষ কুসুম কোঅলী', তাঁর 'মুঠি এক মাঝা বাএ হালে'। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যতই কোমল মনে হোক তাঁকে তাঁর

চিত্তধাতুতে দৃঢ়তার অভাব ছিল না। বড়ায়ি তাঁকে কৃষ্ণের প্রেরিত প্রেমোপহার নিবেদন করলে

কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ।

তাঁর প্রত্যাখ্যানের তীব্রতা দেখে ভীত হয়ে বড়ায়ি বলেছিল

হাণে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী।

কৃষ্ণের কামুকতার প্রতি রাধার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। তাঁর রূপে উন্মত্ত কৃষ্ণকে যে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি তার কারণ তাঁর দৈহিক সামর্থ্যের অভাব।

কাহিনীর মধ্যপর্যায় থেকে রাধাচরিত্রে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কিন্তু সে পরিবর্তন অতিশয় সূক্ষ্ম এবং প্রায় অবোধগম্য। কিছুকাল প্রেম ও ঘৃণার দোলাচলতা ভোগ করে ধীরে ধীরে তিনি কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হয়েছে। ভার-ছত্রখণ্ডে এই নবজাগ্রত প্রেমের অস্ফুট আভাস পাই। অবশেষে বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হলো। রাধা-চরিত্রের এই পরিবর্তনধারা অনুসরণে বড়ু চণ্ডীদাস যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। বিশেষত শেষাংশে রাধার বিরহাবস্থার চিত্রটি অপরূপ। এত তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন একটি বালিকা, যাঁর প্রতিটি উক্তি পরিহাসের দ্বারা শাণিত, বিবেক যার নির্ঝরের মতো স্বচ্ছ, তাঁকেও কৃষ্ণের জন্য হাহাকার করতে হয়েছে। তাঁর জীবনে এই দুঃখই সবচেয়ে শোচনীয় যে তিনি একদিন কৃষ্ণকে বলেছিলেন

চুণ বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা।

অথচ তিনি নিজেই বিরহে বিবশ হলেন। আর, আশ্চর্যের বিষয়, এই তীব্র প্রেমোন্মত্ততার মধ্যেও তিনি কখনো গভীর অনুতাপের সঙ্গে বলেছেন

যে পরপুরুষ সমে নেহা করে
তার হএ হেন গতী।

রাধার অপূর্ব মানসিক জটিলতা ও ভাবদ্বন্দ্বের পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বড়ায়িকে সত্যকার চরিত্র বলে স্বীকার করা কঠিন। এ যেন বর্গচরিত্র মাত্র। নবম শতাব্দীর দামোদর গুপ্ত কিংবা চতুর্দশ শতকের জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য কুট্টনী নারীর যে চিত্র এঁকেছেন তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ায়ির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এমনকি বড়ু চণ্ডীদাস বড়ায়ির দৈহিক আকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন

মাহাপুট নাসা দন্ডহীণে
উন্নতগণ্ড কপোলখীনে। ইত্যাদি

তারও সঙ্গে বিদ্যাপতির দূতীবর্ণনার মিল সুস্পষ্ট। তবু দুয়েকটি স্থলে অন্য সব দূতী চরিত্রের সঙ্গে এর কিছু ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

বড়ায়ি শুধু দেখতেই বৃদ্ধ নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বিস্তৃত। কৃষ্ণ বলেছেন

বিথর দেখিলেঁ বিথর শুনিলেঁ
বিথর তোর বএসে।

প্রথম দর্শনে তাকে নিরীহ ভ্রম হয়, কিন্তু তার স্বভাব যে কুটিল রাধা অত্যল্পকালের মধ্যেই তা বুঝতে পেরে বলেছিলেন

বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন দুঠ বড়ায়ির বাণী।

তবু এটি বড়ায়ির একমাত্র রূপ নয়। তার অন্তরে রাধার জন্য অকৃত্রিম স্নেহও ছিল নিশ্চয়ই। বিরহদশায় রাধাকে আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষায় আবৃত করে রেখেছিল বড়ায়ি। তার চরিত্রে এই

ভাবদ্বৈধটি লক্ষণীয়, কেননা এই দুই ভাব থেকে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বিজাতীয় দুটি উত্তরাধিকারী জন্মেছিল তার। বড়ায়ি চরিত্রের একটি দিক পরিণতিলাভ করেছে ভাবগাম্ভীর্য-মণ্ডিত পৌর্ণমাসী চরিত্রে, অপরদিক হাস্যোদ্দীপক জরতীরূপে।

চরিত্রসৃজনে বড়ু চণ্ডীদাস কতখানি দক্ষতা দেখিয়েছেন অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলে তা বুঝতে পারি। মালাধর বসু কিংবা রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কাব্যে কৃষ্ণ কোনো চরিত্র নন, একটি পৌরাণিক নাম মাত্র। মাধব আচার্য কিংবা দুঃখী শ্যামদাস কিংবা দৈবকী-নন্দন সিংহের কাব্যে কৃষ্ণ ও রাধা সচল কিন্তু সজীব নন। দীন ভবানন্দের কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ এরচেয়ে বেশি পরিস্ফুট অবশ্য, কিন্তু সেকাব্য এত স্থূল হস্তের সৃষ্টি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে তার তুলনা অসঙ্গত। একদা যিনি ছিলেন ঐতিহাসিক মানব, যুগযুগান্তরের ভক্তি-প্রলেপে তাঁর মানুষীমূর্তি বহুকাল আগেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে মানবরূপে পাই না। পুরাণের প্রভাবে সৃষ্ট কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেও কৃষ্ণ ধূসর ছায়ামূর্তির মতো। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়ে এই কারণে চমক লাগে যে কৃষ্ণ ও রাধা অকস্মাৎ এতদিনের সঞ্চিত ধূলি ঝেড়ে সহজ মানুষের মতো চলাফেরা করছেন। তাঁদের দেবত্বে সংশয় প্রকাশ করতে পারি কিন্তু তাঁদের মানবত্ব অবিসংবাদিত।

অহৈতুকীভক্তির চিরাভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ করায় রাধা ও কৃষ্ণ যেমন প্রাকৃতজীবনের কাছাকাছি এসেছেন, কবির ভাষাও তেমনি দৈনন্দিন উক্তি প্রত্যুক্তির স্পর্শে জীবন্ত। এমন শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন যা অব্যর্থ অথচ শিষ্ট নয়। এমন চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছেন যা ধূলিমাটির জীবনের সঙ্গে জড়িত। বড়ায়ির আনা তাম্বুল দেখে রুষ্ট রাধা যখন বলেন

এহা গু আ পান তোহ্মে আপনেই খাহা
আপনাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।

তখন তাঁর ভাষা ঠিক ভক্তিরসাশ্রিত কাব্যের নায়িকার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু এই ভাষাই রাধার মানবত্বের নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমাদিতে কবির বাস্তবমুখী মনের পরিচয় আরো স্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চরিত্রসৃষ্টিতে কবির এতটা সিদ্ধিলাভ ঘটেছে আরো এক কারণে। কাব্যটির গঠনশিল্প বিশ্লেষণ করলে তার নির্দেশ পাই।

কাব্যটি মঙ্গলকাব্য। 'মঙ্গল'শব্দটি আধুনিক কালে শুধুমাত্র লৌকিক দেবদেবীর মহিমাখ্যাপক কাব্যের প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে। এই প্রয়োগ যথার্থ নয়। মূলত মঙ্গল বলতে এক-ধরণের গান বোঝাতো সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বলা হচ্ছে

সব গোআলিনী যাঅ বড়ায়ির সঙ্গে
লাস হাস পরিহাস করি নানা রঙ্গে।
ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল
জাইতেঁ হরিষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল।

পরবর্তীকালে মঙ্গলের অর্থ দাঁড়িয়েছিল একধরণের দীর্ঘকাব্য যার কোনো কোনোটি নাচ-গান সহযোগে পরিবেশিত হতো শ্রোতাদের কাছে। একজন মূলগায়ক সঙ্গে দোহার কিংবা পালি নিয়ে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে আবৃত্তি করে শোনাতেন কাব্য। এরকম অভিনয়তুল্য আবৃত্তির ঈষৎ আভাস রয়েছে জাগের গান, কুশলগান কিংবা অসমীয় ওঝা-পালিতে, আর এরই অপেক্ষাকৃত

জটিলতর রূপ হচ্ছে ঝুমুর নাচ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঝুমুরের সাদৃশ্য স্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদগুলি বিশ্লেষণ করে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন দেখিয়েছেন এরা লাচাড়ী ও লগনী দুটি মুখ্যভাগে বিভক্ত (বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড)। লাচাড়ী বর্ণনাত্মক, লগনী উত্তর প্রত্যুত্তরযুক্ত নাটকধর্মী আলাপ, জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য যাকে তাঁর বর্ণনরত্নাকরে লগনীনাচো বলে নির্দেশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি বড় অংশ লগনীমূলক, অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ির উক্তি প্রত্যুক্তির ওপর গঠিত। কাহিনীরচনার এই বিশেষ ভঙ্গিটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শিল্পকলাকে কতদূর নিয়ন্ত্রিত করেছে ভেবে দেখা উচিত। ভঙ্গিটি নাটকীয় বলে একদিকে যেমন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অতি প্রত্যক্ষ ও শরীরী মনে হয় তাদের, অপরদিকে গল্পের গতিতেও কোনো শ্লথতা সঞ্চারিত হতে পারেনি। এই বিশিষ্ট রূপকল্পটি অবলম্বিত না হলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ থাকতো কিনা সন্দেহ।

লগনীগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠ অংশ। কিন্তু লাচাড়ী অংশেও অপর এক ধরণের সৌন্দর্য রয়েছে। বাস্তবানুগ বর্ণনাকে কথাশিল্পের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে স্বীকার করা হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুয়েকটি বর্ণনা লক্ষণীয়। কবি রাধাচরিত্রের বিকাশ খুব সূক্ষ্মভাবে এঁকে দেখিয়েছেন। দুর্বোধ্য নারীমনের এই বিশ্লেষণে, তাঁর প্রাথমিক বিমুখতা ও পরেকার ঐকান্তিক প্রেমব্যাকুলতার মধ্যবর্তী সংখ্যাতীত পরিপ্রেক্ষিতে তা বিস্ময়কর। নারীর অন্তর্জগতের ভাববৈচিত্র্য, তার পরিহাসশীলতা ও আধিপত্যপ্রিয়তার এক একটি খণ্ড চিত্রকে একালের উপন্যাস-শিল্পের সমতুল্য মনে হয়। কৃষ্ণকে রতিসম্ভোগের আশা দেখিয়ে ভারবহনে সম্মত করে রাধা মথুরার পথে যাত্রা করলেন

দধিভার লআঁ কাহ্ন মথুরাক জাঅ
উলটি উলটি রাধা কাহ্নপাণে চাহে।

কৃষ্ণের দুর্গতি রাধা নিঃশব্দে উপভোগ করছিলেন। আবার রাধা নিজেই যখন মনে মনে কামনার দ্বারা চঞ্চল তার বাহ্য লক্ষণগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এরকম

বৃন্দাবন জাঅ রাধা রস পরিহাসে
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁ পাশে।
সঘন ছাড়িল রাধা হাম্বী আপার। চুম্বন করিল রাধা সখীর বদনে
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার ভাল গীত গাঅ বুলী পাড়িল মদনে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শিল্পগত উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভরশীল এর বাস্তবধর্মী চিত্রাবলীর ওপর।

সকল বৈষ্ণবকাব্যই কৃষ্ণের অলৌকিক মাধুর্যের ইঙ্গিত দেয়, যেমন পদাবলী তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কিন্তু শুধু এই কারণে পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিচার একই মানদণ্ডে হতে পারেনা। রূপকল্পের ভিন্নতার ফলে দুটির বিচারের মানদণ্ডও পৃথক হয়ে গেছে। পদা-বলীর রস গীতিকাব্যের, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস আখ্যানগত। আখ্যায়িকা গঠনের নিয়মাবলীতে এই কাব্যের বিচার সঙ্গত বলে এর রূপকল্পের বৈশিষ্ট্য আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। বর্ণনা-ময় এর আখ্যান, একে দ্রুতগতি দান করেছে নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তিময় অংশগুলি। আর এই আখ্যান কৃষ্ণলীলার অন্যান্য আখ্যান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে এর বাস্তবাভিমুখিতার ফলে। মর্ত্যজগতের দিকে ঝুঁকে পড়ায় শুধু অলৌকিকতার রুদ্ধশ্বাস পরিমণ্ডল থেকে একাব্য বার হয়ে এসেছে এই নয়, এর ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে অশ্লীলতার স্পর্শ পর্যন্ত লেগেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতার সমর্থনে অনেকপ্রকার যুক্তির অবতারণা সম্ভব। হয়তো এটি তৎকালীন সামাজিক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এসমস্ত যুক্তি গৌণ। শিল্পগত কারণেও

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এসব অনৈতিক উপাদানকে মেনে নিতে হয়। যে কোনো শিল্পবস্তু ধরা যাক, তার একটি সামগ্রিকতা আছে। যদি এতে এমন কিছু থেকে যাকে যা এই সামগ্রিকতাকে, মৌল কল্পনার অবিভাজ্যতাকে, ব্যাহত করে তবে তা শিল্পকলার বিচারে নিন্দনীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিচারেও আমাদের ভেবে দেখতে হবে এর নীতিবিগর্হিত ঘটনাগুলি কি বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত, অথবা কোনো গূঢ়তর মূল কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলো ত্যাগ করলে রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রের কতটুকু প্রাণময়তা অবশিষ্ট থাকে তা ব্যাখ্যা করে বলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

পূর্বে বলেছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষয়ে পণ্ডিতমহলে প্রশ্নের অন্ত নেই। একাধিক কবেকার লেখা? 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একসময় মতপ্রকাশ করেছিলেন এটি গীত গোবিন্দের পূর্বে রচিত। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন এর ভাষা ১২০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী। লিপি বিচার করে 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এটি চতুর্দশ শতকের গোড়াতে রচিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের মতে এর রচনাকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ। 'যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলতেন, রচনাকাল নিশ্চয়ই ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পরেকার। শ্রীসুকুমার সেনের মতে এটি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের গোড়াতে লিখিত। এরমধ্যে কোন তারিখটি পাঠক গ্রহণ করবেন? পুঁথিটিকে সাধারণত খুব প্রাচীন বলে মনে করা হয়। বর্তমান লেখক পুঁথি বিচার করে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। তবে পুঁথি যাই হোক ভাষা দেখে কৃষ্ণের চরিত্র দেখে বৈষ্ণব মতবাদের যে রূপটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তার বিচার করে হয়তো বলা যায় একাধিক ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা হওয়া সম্ভব। আবার কবির পরিচয় নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। ইনি কোন চণ্ডীদাস? 'লঘুবৈষ্ণবতোষণী' নামক টীকায় জীবগোস্বামী দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড রচয়িতা যে শ্রীচণ্ডীদাসের উল্লেখ করেছেন ইনি কি সেই কবি? রায় রামানন্দের সঙ্গে বসে মহাপ্রভু জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের মতো যে চণ্ডীদাসের কাব্য পড়েছেন বড়ু চণ্ডীদাস কি তাঁরই নাম? ভক্ত বৈষ্ণবেরা একথা স্বীকার করেননি। অথচ গীতগোবিন্দ পাঠের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন মহাপ্রভুর পক্ষে কেন নিষিদ্ধ হবে বোঝা দুষ্কর। অর্থাৎ এসমস্ত জিজ্ঞাসার কোনো একটি বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র।

কিন্তু এসব প্রশ্নের সমাধান না হলেও ক্ষতি নেই। যেকালেই লেখা হোক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (ধরা যাক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে), যিনিই হোন না কেন বড়ু চণ্ডীদাস (ধরা যাক এটি ছদ্মনাম), অন্তত একটি বিষয় নিশ্চিত যে অন্য কোনো কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে আখ্যানরস এত পরিপুষ্ট নয়। বড়ু চণ্ডীদাস নিজেকে বাসলীর সেবক বলেছেন। এর অর্থ নিষ্ঠাবান পদকর্তা মহাজনদের সগোত্র তিনি ছিলেন না। রাধাকৃষ্ণ সম্ভবত তাঁর কাছে শুধুমাত্র কাহিনীর উপজীব্য বিষয় ছিলেন হয়তো এই কারণেই অন্য ভক্ত কবিদের মতো কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে পরিভ্রমণ না করে তিনি গতানুগতিক জগতের বাইরে পদক্ষেপ করেছিলেন।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনবিহারীকে ধীরে ধীরে যেতে হয় দোকানে। ফিরতে হয় দুপুরে আবার খেতে। দুপুরে ফেরাটাই আরও কষ্টকর হয়। ওই জন্যে বনবিহারী আজকাল সবদিন দুপুরে ফেরে না। শরীরটা ভেঙে আসে। সবাই যখন চলে যায়। দোকানের মালিকও চলে যান। তখন ও দোকানের একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে খানিকটা গড়িয়ে নেয়। একটু গড়াগড়ি করে আরাম লাগে। খিদে হয়ত পায়। মরেও যায় খিদেটা। একেবারে রাত্রে বাড়ী এসে স্নান করে ফেলে। তারপর কিছু খেয়ে ঘুম। মৃগনয়নী দেখে। এক একদিন বলে,— এমন করে ত' আর বেশী দিন চলবে না! বনবিহারী হাসে।— না চলল! বাঁচবার সখ মিটে গেছে। চোখে তারাদুটো ওর এক সুগভীর হতাশায় ঘোলাটে হয়ে গেছে। মৃগনয়নী তবু একবার বলে,— না হয় ট্রামে এসো দুপুরে খেয়ে যেও।

—আবার ট্রামের পয়সা খরচা

—তা হোক। খরচা আমি বুঝব।

বনবিহারী আর কোন কথা বলে না। পরদিনও দুপুরে আসে না। আসে অনেক রাত্রে। মৃগনয়নী গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বনবিহারী শুতে আসে। মৃগনয়নী শুতে আসে আর খানিক পরে। এসে দেখে বনবিহারীর তামাক খাওয়া হয়ে গেছে। বসে আছে চুপকরে। তাকিয়ে রয়েছে অমল আর কমলের দিকে। কমল ঘুমোচ্ছে। অমলও। কমল আজকাল খুব বেশী রাত করে না ঠিকই। কিন্তু সকালে বেরিয়ে বাড়ী আসে সেই রাতে। এর ভেতর আর বাড়ী আসে না। অমলও আজকাল একটু রাত করছে। দুএকদিন ধমক দিয়েছিল মৃগনয়নী। আর ভাল লাগে না। একটা কথা ও মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছে যে ধমক দিয়ে ছেলে ভাল করা যায় না। বনবিহারীকে কিছু বলে না অসুস্থ শরীরে হয়ত বেশী মারধোর করে বসবে। মনে মনে বেশ বুঝতে পারে মৃগনয়নী যে স্কুলের ছেলে অমল যতটা রাত্রি করে আর যে ভাবে চলাফেরা করে তাতে ওর ভবিষ্যত খুব একটা কিছু নেই। উল্টো কোন বিপত্তি ঘটে যেতেও পারে। যেদিন খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।—পড়াশুনা ত' কিছুই করিসনে কি করে পাশ করবি। অমল ভাত খেতে খেতে বলে,— ও পরীক্ষার আগে মেরে দোব।

—কি করে?

—সে সব তুমি জান না। অনেক কায়দা আছে।

—মনে মনে হাসে মৃগনয়নী। এঁকি কুস্তির প্যাচ। কায়দা করে মেরে দোব!

—এত রাত অব্দি কোথায় থাকিস?

মাথাটা চুলকে দুটো হাই তোলে অমল।

বলে,— ও ইয়ে—আমাদের ইয়ং ড্রামাটিক কেলাবের থিয়েটার হবে কিনা?

—তুই থিয়েটার করবি?

—আমারই ত' মেন পার্ট। পারুলের পার্ট আমার।

পারুলের পার্ট! বলে কি অমল'

—পারুল কে?

—ওই যে মনোতোষের সঙ্গে ইয়ে হবে, তার পর কাট্ মারবে। খুন করে ধরা পড়বে। কি

বইখানা মা! তুমি যাবে দেখতে? চ্যারিটি হবে যাবে? তোমার পয়সা লাগবে না।

মৃগনয়নী গম্ভীর ম্লান মুখে বলে,— না।

একছেলে পারুলের পাট করছে। এক ছেলে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপর আর কথা সরে না মৃগনয়নীর মুখে। বনবিহারীকে কিছু বলে না। আরও ভেঙে পড়বে ও। ওপরে এসে যখন মৃগনয়নী দেখে বনবিহারী নু ছেলের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে। ওর বুকের ভেতরটায় রোগা মানুষটার জন্য মায়া লাগে। কথা বলে না। বনবিহারী আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। ডাকে মৃগনয়নীকে।— শোন। মৃগনয়নী ওর কাছে যায়। ওর গায়ে হাত রাখে।পাঁজরের হাড় হাতে ঠেকে। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠা-নামা করে পাঁজর। এই হাত কখানা নিয়েই ত' সে প্রাজীবন সংসার করছে! কতকাল হয়ে গেল, বিয়ের দিনেই বনবিহারী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কত লোক কত বললে। সেইদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল মৃগনয়নী এই সম্পল করেই তাকে ভাসতে হবে। এক কংকাল হবে তার সঙ্গী। আজ পর্যন্ত চলে এসেছে।

—আমার বোধহয় রোজ জ্বর হয়।

বনবিহারীর কথাগুলো ওর কাণে আসে। ও নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে। বনবিহারীর পাঁজরের ওপর ওর হাতখানা কাঁপে। আজ কেবলি মনে হয়, আর বুঝি টেঁকে না। এই সাজান হাড় কখানা আর বুঝি রইল না।

—আমি বুঝতে পারি, রোজ জ্বর হয়। আর পেটের যন্ত্রণাটা সবসময়ই যেন হচ্ছে।

আবার বলে বনবিহারী।

মৃগনয়নী বলে আস্তে আস্তে,— কাল ডাক্তারের কাছে চলো।

—তা কখনও হয়। অসুখ হলে ডাক্তার দেখাতেই হবে।

বনবিহারী যেন ভাবতে ভাবতে বলে।—আবার দোকান রয়েছে। কখন সময় হবে—।

—দোকানে কাল যাবে না।

—তা হয় না।

—খুব হয়। আমি কাল শিকল দিয়ে রাখব তোমায়।

বনবিহারী হাসে। খুব খানিকটা হেসে ফেলে আজ।

মৃগনয়নী বলে,— হাসি নয়। কাল থোকাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে।

—কমলের আবার কলেজ!

—বাবার অসুখ হলে কলেজ যাবে না।

—না। ওর আবার শক্ত পড়া।

—হোক শক্ত পড়া। তোমার শরীরের কাছে পড়া কিছু নয়!

বনবিহারী মৃগনয়নীর হাতখানা ধরে কাছে টানে।

—তাছাড়া টাকা কোথায়—?

কথাটা মৃগনয়নীও ভাবছিল, বলে—টাকার ভাবনা আমার।

—একটা কথা সত্যি বলবে?

—বলো।

—কমল কি ওর জলপানির টাকা তোমায় দেয়?

মৃগনয়নী এতদিন এ কথার উত্তর এড়িয়ে যেত। আজ বলে,— না। দেয় না।

—একবারও নেয় নি?

—না।

—কি করে ও টাকা?

—জানি না। বোধহয় স্বদেশী কাজে দেয়।

বনবিহারীর মুখখানা আবার পাণ্ডুর হয়ে যায়। পাঁজরের হাড়গুলোর ওঠা-নামা বেড়ে যায়।

মৃগনয়নী বলে।—তার কাছ থেকে এ মাসে টাকা চেয়ে নেব।

—কেন?

—তোমার জন্যেই।

—না। কক্ষণো নয়। ওর টাকা ও যা খুসী করুক। কক্ষণো নয়।

হঠাৎ যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে বনবিহারী।

মৃগনয়নী ওকে নামাবার জন্যে বলে।— তবে নোব না। যাক।

—না। নিও না। ওর সঙ্গেও আমি কোথাও যাব না। তুমি জান না। ওকে দেখলেই আমার শরীরের ভেতর কেমন করে।

—বেশত আমি তোমায় ডাক্তার খানায় নিয়ে যাব। এবার তুমি ঘুমোও।

গলার স্বরটা এবার নিস্তেজ হয়ে পড়ে বনবিহারীর।—ঘুম! ঘুম আর এ জন্মে হবে না।

মৃগনয়নী হাতপাখাটা নিয়ে আসে। বাতাস করে বনবিহারীকে ধীরে ধীরে।

পরদিন বনবিহারী ভোরে উঠেই দোকানে বেরিয়ে যায়। মৃগনয়নীর কথা কিছুতেই শোনে না। দু চারটে দিন এমনি ঝোঁকের ওপরই কাজ করে। কিন্তু আর পারে না। কয়েকদিন পর জ্বরটা খুব বেশী মনে হয়। সেদিন ভোরে আর উঠতে পারে না বনবিহারী। আর তেমনি যন্ত্রণা পেটে। যন্ত্রণায় কোঁকাতে থাকে। একটু পরে কল ঘরে যায়। এসে বলে,—রক্ত পড়ল। আমাশার সঙ্গে রক্ত। মৃগনয়নী জানত। কে যেন সব ওকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয়। মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যায় ও, আগে থেকেই ও জানত, এমনি একটা কিছু হবে। কমলকে ডাক্তার ডাকতে বলে মৃগনয়নী। কমল ডাক্তারের বাড়ী চলে যায়। মৃগনয়নী পাখা নিয়ে বসে বনবিহারীর বিছানার পাশে। ডাক্তার আসেন। সেই বাইরেটা যার কুশ্রী ভেতরটা শ্রীময়। বাইরেটা যার কঠিন, ভেতরটা শিশুর চেয়েও নরম। যার বউ বাঁণা বিপরীত ধর্মিণী। তিনি এলেন। দেখলেন। ভাল করে দেখলেন। বাইরে এসে মুখটা কালো করে বললেন।— পাশেই ত' ছিলাম। আগে ডাকতে পারেননি। এত আজকের রোগ নয়। মুখ নীচু করে থাকে মৃগনয়নী। কিছু বলবার নেই। সব অপরাধই তার। শুধু বলে।— কেমন দেখলেন? তেমনি কর্কশ স্বরেই মুখখানা আরও কুশ্রী করে বলেন,— তেমন আশা কিছু দেখছি না। চেষ্টা করা যাক। আপনার সেবা আর আমার ওষুধ। মৃগনয়নী আর কথা বলে না। ভিজিটের টাকা দেয় হাতে। ডাক্তার বলেন,— ওষুধ আনতে আধ ঘন্টা পরে পাঠাবেন। চলে যান তিনি। কমল কাছেই ছিল। সবই ওর কাণে আসে। মৃগনয়নী কমলের দিকে তাকায়। কমল মুখটা নীচু করে। চোয়ালদুটো ওর তেমনি চাপা।

—সব ত' শুনলি?

—হুঁ।

—একটা কাজ করতে হবে তোকে।

কমল তাকায়।

—ও'র দোকানে গিয়ে কিছু টাকা আনতে হবে। টাকা আর নেই বাবা।

কমল তেমনি গম্ভীর মুখে বসে থাকে। মৃগনয়নী ঘরে ঢুকে যায়। কমলকে না বলে আর উপায় নেই তার। একখানি গয়নাও আর নেই যে গয়না বেচে টাকা আনবে। কোন ভরসাই আর

দেখা যায় না। শুধু সময় গোনা ছাড়া আর কি করবে সে।

বিকেলে কমল একবার বাড়ী আসে। মৃগনয়নী দেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উঠে আসে ওর কাছে।

—দোকানে গিয়েছিলি?

হুঁ!— কমলের মুখখানা নীল হয়ে গেছে লক্ষ্য করে মৃগনয়নী।

—টাকা পেলি?

—না।

—কি বললে?

কমল চুপ করে থাকে।

—কি বললে, বল। আর চুপ করে থাকিস নি বাবা।

—অপমান করে বেরিয়ে যেতে বললে!— থরথর করে কাঁপে কমলের গলা।

মৃগনয়নী দাঁড়িয়ে রইল একটু সময়। তারপর যন্ত্রের মত আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর চলে এলো। কমলও যেন যন্ত্রের মত বাইরে বেরিয়ে গেল পায় পায়।

পরদিন ডাক্তার এলো। ওষুধ এলো। টাকা লাগল না না। আর একটা দিনও আর যায় না। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। জ্বর বেড়েই রয়েছে। জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

বিকেলে কমল আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মৃগনয়নী আজ আর উঠে এলো না।

—মা।

মৃগনয়নী শুনেও যেন শোনে না। কমল যেন আর ওকে মা বলে ডাকে না। মৃগনয়নীর মুখখানা কি পাথরের? কমল আবার ডাকে— মা! মৃগনয়নী তাকায় না। কমল ঘরে আসে। পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে মায়ের হাতে দেয়। বলে!— দুশ' টাকা আছে। আরও লাগলে বোল। মৃগনয়নীর পাথরের চোখ গলে পড়ছে বুঝি! কমল হাসে,—এক বন্ধু দিলে। ধার দিলে। মৃগনয়নী টাকাটা আঁচলে বাঁধে। কমলকে বলে,— আজ আর বেরোসনি।

—না। আর বেরোব না।

কথাটা বলতে বলতে গলা কেঁপেছিল। বেরোতে ওকে কেন বারণ করলে? মৃগনয়নী কি কি সব বুঝতে পাচ্ছে। মৃগনয়নী কি জানছে আর হাড় কখানা বুঝি রইল না। একি ভাবছে মৃগনয়নী। ভাববে না। কিছুতেই ওসব ভাববে না।

ভাবনাই সত্য হোল। সন্ধ্যের আগেই মারা গেল বনবিহারী। তেমনি পড়ে রইল বিছানার ওপর। শুধু পাঁজরের হাড় কখানার ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেল। মরবার দুদিন আগে থেকে কথা বলতে পারেনি। একবার শুধু মৃগনয়নী মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চোখের কস বেয়ে পড়েছিল ফোঁটা ফোঁটা জল। কি ভাবছিল কে জানে? কেন চোখের জল পড়ল কে জানে! আর জানতে চায় না মৃগনয়নী।

কমল এলো। অমল এলো। দু ভাই অবাক হয়ে ভাবছিল মায়ের দিকে তাকিয়ে, মা কি পাথরের? এমন অনড়! এমন অটল! ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল ওরা। মৃগনয়নী আঁচল থেকে দুশ টাকাই খুলে দিল কমলের কাছে,— যা আনবার সব নিয়ে আয়। কমলের টাকায় বনবিহারীর চিকিৎসা হয়নি। বনবিহারী চায় নি। তাই হয়ত হয়নি। কমল মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। মায়ের চোখে ত' জল নেই! ভয়ে ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

হিসেব করতে গেলে আর কিছুই থাকে না বাবা।

মৃগনয়নী বলত আমাকে। অবাক হয়ে শুনতাম তার কথা। দুয়ে আর দুয়ে যোগ করলেও শূন্য হয়ে যায়। যদিনা সেই প্রথম এক থাকে। সবই এক বাবা। দুই ছয় বারো যা দেখ ওগুলো ভাগাভাগি। কথায় বলে না, আলেখে আসে আলেখে যায়। কিন্তু খোলা থেকে রস জ্বাল হয়ে নামলে সবই জোলো-জোলো। তখন কি জানতুম। উনি মরেন নি। দেহটা ছেড়ে চলে গেলেন। দেহটার দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলুম, এইটে শ্মশানে পুড়লেই ওঁর সব শেষ হয়ে গেল। শেষ কি অত সহজে হয়। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছি আজ। হাসত মৃগনয়নী। আমার শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা। কথাগুলো সামান্য নয়। এই কন্যাও সামান্য নয়। তবু ওকে দেখলে বোঝবার উপায় কি কিছু আছে! কিছু না। ভাগ্যিস মৃগনয়নী মনটাকে নিজে থেকে খুলে ধরেছিল আমার কাছে। তাই ত' আজ সেই কন্যার কথা শোনাতে বসেছি। জীবনটা গল্পের মতই। এক ছিল রাজা, হাতী, ঘোড়া, রাজবাড়ী, মন্ত্রী, কি না ছিল। কত জীবন! কত কথা! রাজকন্যে, রাজপুত্তুর! জমজমাট। রমারম। রাজার রাজ্যি গেল। কোথায় গেল হাতী, ঘোড়া! কোথায় বা কি! গল্প ফুরিয়ে গেলো। নটে গাছটা কেমন তরতর করে বেড়ে উঠেছিলো। এখন মুড়োল। তবু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, হ্যাঁরে নটে। মুড়োলি কেন? চিরদিন নটেগাছটি থাকুক। এইটেই মানুষের প্রাণের ইচ্ছে কিনা। কিন্তু নটে গাছ ত' চিরদিন থাকে না। এই সত্যিকে মেনে নিতে পারা যায় না কিছুতেই। কি বল বাবা?

আমার দিকে তাকিয়ে হাসত মৃগনয়নী। মৃগনয়নীর ওই হাসিটা আমি ভুলতে পারি না। অমন নিশ্চিন্ত খোলাখুলি হাসি আমি জীবনে দেখিনি। বনবিহারী মরে যাবার পরও তেমনি নাকি হেসেছিল ও। কমলের সামনে। কমল ভয় পেয়ে গেল আরও। মায়ের হোল কি?

—কিছুই হয়নি বাবা! তোরা খুব ভয় পেয়ে গেছিস বোধহয়। ভয় কি!

হাসতে হাসতেই বলেছিল মৃগনয়নী,— এ আমি জানতুম। এখন যা কর্তব্য সব করে ফেল। কর্তব্য সবই করতে হবে বই কি! কমল সে কথা জানে। কিন্তু তাই বলে মা যে এ রকম করে বলবে একথা ভাবতেও পারেনি কমল। যার কাছ থেকে একবার দুশ টাকা এনেছিল। তার কাছ থেকেই আরও দুশ টাকা আনতে হোল। কাজও সব কোন মতে মিটল। মৃগনয়নী বেশী কথাও বলল না। অল্প কথাও বলল না। শ্রাদ্ধের সময় পুরুত মশাইকে বলেছিল,— কাজটি ভাল করে করুন। ও যেন শান্তি পায়। বেঁচে থেকে ত' একদিনও একটু শান্তি পায় নি! চোখ-দুটো একটু বা চিক চিক করে উঠল। তবু কাঁদল না মৃগনয়নী। কমল কেঁদেছিল একেবারে লুকিয়ে কলঘরে। অমল কিন্তু কাঁদল সব চেয়ে বেশী। সকলের সামনে প্রায় চীৎকার করে।

কান্না আর কদিনই বা থাকে। আবার ভোর হোল, সন্ধ্যা হোল। কমল কলেজে বেরোল। অমল ইস্কুলে। মৃগনয়নী রান্নাঘরে গেল। রান্না করল। সবই করল। কিন্তু মৃগনয়নী মনটাকে যেন ফেলে অন্য কোথায়। এ সবের ভেতর আর মন নেই ওর। বহুকাল ধরে যে মনকে সংসারে বসিয়েছিল। সেই মনকে ভোলবার চেষ্টা সুরু হোল ওর। মনকে ভোলা বড় কঠিন। তবু অভ্যেস কি না হয়! ভাল যখন লাগে না। তখন অভ্যেসটাও জোর করে করতে হয় না। আপনা-আপনিই মন উঠে আসছে ওর। কমলের চেয়েও এখন কথা কম বলে মৃগনয়নী। মনে মনে কথা বলে অন্য কোথাও। কমলই বরং কথা বলছে একটু বেশী,—ভেবো না মা! মৃগনয়নী ভাসা-ভাসা হাসে। তাকায় বিছানা পাততে পাততে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলে কমল,—কিছু ভেবো না। দুটো বাড়ীতে ছেলে পড়াবার কাজ পেয়েছি। তাতে পঞ্চাশ টাকা পাব। মানে খুব বড় লোকের বাড়ীর কাজ। মৃগনয়নী তেমনি ভাসা-ভাসা তাকায়।

—পঞ্চাশ টাকায় চলবে না মা?

অমল শুয়ে পড়ে বলে,— তা আর চলবে না? বাবা ত' পয়তাল্লিশ টাকা পেত। মৃগনয়নী শুধু হাসে ছেলেদের কথা শুনে। অমলের কথা কমলের ভাল লাগে না। ও তাই আবার মাকে জিজ্ঞেস করে।—চলবে না মা?

—খুব চলবে।—বলে মৃগনয়নী।

কমল আশ্বস্ত হয়।

মৃগনয়নী নিজে মাদুর পেতে নেয় একখানা। একটা ছোট বালিস নেয়। আস্তে আস্তে বসে মাদুরের উপর। একটু এপাশ ও পাশ করে ঘুমিয়ে পড়ে কমল আর অমল। মৃগনয়নী বসেই থাকে। চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। বনবিহারীর কথাটা মনে হয়, ঘুম কি আর আছে? মৃগনয়নীরও ঘুম নেই আর। দুশ্চিন্তায় নয়। অন্য চিন্তায়। এক চিন্তায়। সংসারের আসল রূপটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে। নির্জন রাত্রিতে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা কত গাঢ় সুনীল। কত স্থির, কত শান্ত। মেঘ জমে। ঝড় হয়। বিদ্যুৎ চমকায়। তাতে আকাশের কি এলো গেলো! ও কত বড়। কত মহান। দূর থেকে ত' কত রঙ আকাশের। নানা রঙে রঙীন হয়। কখনও ভোরের সূর্যের রঙে। কখনও চাঁদের ছায়া-ছায়া আলোয়। হোক না রঙ। নিজের কোন রঙ নেই। সংসারের রঙ গায়ে লাগবে কেন? রঙ হবে, রঙ যাবে। ওদের নিয়মে ওরা ফুটবে, মুছবে। মৃগনয়নীর মনে রঙ ধরবে না। এত সব রঙে যে রঙায়, তাকে ভাবলে আর রঙ বসে না মনে। মৃগনয়নীর এক চিন্তা। একেরই চিন্তা। তারই ধ্যান। কোন কোন এক রাত্রে কমল হঠাৎ জেগে গেলে মাকে বসে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে।

—মা।

মৃগনয়নীর কানে যায় না কথা।

—ওমা, মা!

মৃগনয়নী নড়ে বসে। ফিরে তাকায়।

বলে।—কিরে?

—ঘুম আসছে না তোমার?

ও কথার উত্তর না না দিয়ে মৃগনয়নী বলে।—তুই ঘুমো।

—তুমি কি একেবারে ঘুমোও নি?

মৃগনয়নী আবার বলে।—তুই শুয়ে পড় না?

কমল আরও কাছে আসে,— অত কি ভাবো। তুমি আগে শুয়ে পড়ো। নইলে আমিও

—বসে থাকবো। শোব না।

—বড় বিরক্ত করিস খোকা।

—কি অত ভাবো?

এই কথাই বেশ কিছুদিন আগে মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করেছিল কমলকে। আজ কমল জিজ্ঞেস করছে মৃগনয়নীকে।

—কি আবার ভাববো।— হাসে অল্প একটু মৃগনয়নী।

—ভাবতে পারবে না। শুয়ে পড়ো। আমি বাতাস করি।

মৃগনয়নী হেসে ফেলে।— তোর আর বাতাস করতে হবে না। আচ্ছা আমি শুচ্ছি। তুই শো।

মৃগনয়নী কাত হয় এবার খালি মেজেতে। আজ আর মাদুরটা পাতাও হয়নি। মাঝে মাঝেই এমন হয়। আঁচলটা পেতে ভোরের দিকে শুয়ে পড়ে কোন কোনদিন। কোনদিনবা অমলের বিছানার পাশে।

—আমি তোমার কাছে শোব।

কমলও মেজেতে শুয়ে পরে মায়ের পাশে।

মৃগনয়নী বলে,— তুই বিছানায় গিয়ে শো।

—তুমি তবে বিছানা পেতে নাও।

অগত্যা মৃগনয়নীকে মাদুরটা পেতে নিতে হয়।

কমল মাঝে মাঝেই এমনি করে। মৃগনয়নীর খাবার সময় কাছে এসে বসে। মায়ের ভাতের দিকে তাকিয়ে বলে,— আচ্ছা শুধু আলু সেদ্ধ দিয়ে মানুষ খেতে পারে?

মৃগনয়নী ভাত মেখে নেয়।

—আরও ভাত নাও।

—না। আর না।

—এই খেয়ে ত' দুবেলা থাকবে।

—তা হোক।

—তবে দুটি আলু ভেজে দিই।

বলে কমল আলু কুটতে যায়।

মৃগনয়নী বলে,—বিরক্ত করিসনি খোকা। তুই বড় জ্বালাস।

—কি আর খাটুনি। দুটো আলু কুটে ঘুটে জ্বালিয়ে ভেজে দোব।

—না। কাল না হয় করে নোব।

—ঠিক করে নেবে ত'।

—নেব। তোদেরও দোব। আমিও নোব।

কমল বসে বসে মায়ের খাওয়া দেখে।

হঠাৎ বলে।— আচ্ছা মা, কমলির মায়ের ঘরে গয়লা আসে না?

—আসে।

—গয়লার কাছ থেকে এক পো করে দুধ নিও।

—কার জন্যে?

—আমি খাব।— বলে হাসে কমল।

মৃগনয়নী খুব বিরক্ত হয়— বেশ তুই খাবি। আমি কিন্তু এক ফোঁটাও খাব না।

—সে দেখা যাবে।— কমল তেমনি হাসে।

বনবিহারীকে এক ফোঁটা দুধও খাওয়াতে পারেনি। এ কথা মৃগনয়নী ভোলে কি করে। ও দুধ খাবে কোন মুখে। গলা দিয়ে নামবে না। তবু কমলের জোর। কমলের জিদ। সব সময় যেন মৃগনয়নীর ওপর চোখ রয়েছে। মৃগনয়নী যত সব কিছুর ওপর থেকে নজর সরাচ্ছে, কমল ততই নজর দিচ্ছে মৃগনয়নীর ওপর। দুধ অবশ্য কিছুতেই খায় নি মৃগনয়নী। কমল জোর করেছে। ভয় দেখিয়েছে। তাহলে ভাত খাওয়া ছেড়ে দেবে কমল। তবু মৃগনয়নী খায় নি। শেষ পর্যন্ত বলে কমলকে।— দেখ খোকা, ভুলতে আমি সবই চাই। কিন্তু সব কথা কি এ তাড়াতাড়ি ভোলা যায়। তাঁকে কতটুকু দুধ খাওয়াতে পেরেছি। রোগা মানুষ। বেরোবার সময় বার বার ফিরে তাকিয়েছে। মুখখানা শুকনো করে বলেছে, পা দুটো আর চলে না। অবশ অবশ লাগে।

চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি করেছি বল? মৃগনয়নীর চোখদুটো ভিজে ভিজে লাগে। কমলের মুখটা ম্লান হয়ে যায়। আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে যায়।

দিনগুলো এমনি করেই কাটাচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যায় কমল একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলো বাড়ীতে। সামনে কমল পেছনে মেয়েটি। ওরা যেন খুব সন্তর্পণে ঢুকল বাড়ীতে। মৃগনয়নী ঘরের দোর ভেজিয়ে বসেছিল ঠাকুরের পটের সামনে। পটের দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর চোখ বুজল। বাইরে জুতো খুলে মেয়েটি কমলের পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। কমল দেখল মাকে এখন ডাকা যাবে না।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে,— বস।

মেয়েটি বসল হাঁটু মুড়ে সাড়ী সামলে নিয়ে। কমল বসল জানলার তাকের ওপর কোলের ওপর হাত রেখে। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। খানিক পরে এক বড় নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নী তাকাল। মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। মাজা মাজা রঙ। আঁটসাঁট দেহটি। মুখখানি গোল। চোখদুটি একটু ছোট কিন্তু সুতীক্ষ্ণ দীপ্তিময়ী। হাসল মেয়েটি। গালে ছোট ছোট দুটি টোল পড়ে হাসলে। ঘূর্ণির মত। নাকটি একটু চাপা আর কমলাকোয়ার মত ফুলো-ফুলো দুটি ঠোঁট। মৃগনয়নীর বেশ লাগছে দেখতে।

উঠে দাঁড়ায় মৃগনয়নী। কাছে এসে মেয়েটি প্রণাম করে। মৃগনয়নী কমলের দিক তাকায়। কমল মুখের ঘাম মুছে বলে,—একটু বাইরে এসো মা। একটা কথা আছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কমল বলে,—তুমি একটু বস। মেয়েটি হেসে আবার বসে পড়ে। কোলের ওপর একটা চামড়ার ছোট ব্যাগ নজরে পড়ে মৃগনয়নীর। ও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসেই।

—এটি কে খোকা?

—তুমি বাইরে এসো।

—মেয়েটি হঠাৎ বলে,—এখানেই বলো না কমল।

কমল একবার তাকায় মেয়েটির দিকে, আবার মায়ের দিকে।

—কিই বা কথা,—মেয়েটি বলে,—আমি এ বাড়ীতে দিনকতক থাকব মাসীমা।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকায়।

কমল বুঝিয়ে বলে,—তুমি ত' জান—সবই। এ মেয়েটিও আমাদের দলের। ওর পেছনে পুলিশের ফেউ লেগেছে। ওদের বাড়ীতে সার্চ হয়ে গেছে। এখন ওকে ধরতে পারলেই জেলে পুরবে। ওকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তাই অন্ততঃ কিছু দিন আমাদের বাড়ীতে লুকিয়ে থাকতে চায়।

মৃগনয়নী বোঝে।

—বেশ ত'। ওর বাপ মা!

—তাঁরা সব জানেন।

—ওদের বাড়ী কোথায়?

—ও সব কথা এখন থাক মা। ওর নামটাও পালটে দিতে হবে। ওকে কাবেরী বলে ডেকো। পরে সব বলব।

(ক্রমশঃ)

অলাত চক্র

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

সকাল-সন্ধ্যা এক-ই সুরে সাধা পুরাতন মন
বহুবার পাওয়া অনুভূতি মাঝে চমকে উঠে
একঘেয়ে কোন ছন্দ জাগালে? খঞ্জ জীবন
বাধা জীবনের চলতি নিয়ম ভেঙ্গে চলো ছুটে।।

কতদিন আর কতদিন বলো এমনি করেই
স্বাক্ষর দোব বুড়ো পৃথিবীর হাজিরা-খাতায়!
চক্রবৃদ্ধি সুদে বেড়ে ওঠে মৃত্যুর দেনা; সেই
পাওনার ভার জমা হয়ে আছে রোজ নামচায়।

এখন কী মন জাবর কাটছো সেই পুরাতন
অতীত স্মৃতি? মৃত-বরষের ফুলগুলি তুলে,
গন্ধ না পেয়ে, ছেঁড়া আঁচলেতে করেছ গোপন;
(ঝরে যায় ফুল তবু অচেতন গ্রন্থি খুলে)।

সব মুছে যাবে; কিছুই রবে না। তোমার হিসাবে
যাই থাকনাকো। তাও মুছে যাবে। তুমি কী জানো না?
যদি জানো তবে খুড়িয়ে চলার কৃপণ স্বভাবে
সূর্য-ওঠার পথে পথে কেন ছড়ালে কান্না?

এক ইচ্ছার মৃত্যু

অসিত দত্ত

এ ইচ্ছার চিৎকারে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয় মন।
এ যেন নদীর তীরে গিয়ে শূন্যে ফিরে ফিরে আসা—
অপার দুরন্ত তৃষ্ণা, ট্যাণ্টালাস-সুতীব্র-পিপাসা;
তবু হায়, জ্যামিতিক রেখা-বাঁধা—সময়, জীবন।

অথচ যে জীবনকে উপভোগ করে নিতে চায়।
জানালার গরাদে সে মাথা রেখে তবু দাঁড়িয়েছে,
গুনেছে অনেক ঋতু—রোদ্‌দুর ছায়া ফেলে গেছে;
ছায়া পড়ে না ত' তার নির্বিকার মুখের রেখায়!

জীবনটা দুঃসহ, কী সংকীর্ণ পরিধিতে ঘোরা!
তবুও আকাঙ্ক্ষা তার রৌদ্র হয়ে ছুঁতে পৃথিবীকে
উরু বুক ঠোঁট দিয়ে; এ বাসনা হয়ত রবে না—
পাথরের মূর্তি হবে ঃ কোণার্ক কি অজন্তা ইলোরা
ভাবে সে আকাশে শূন্যে চেয়ে অপলক নির্নিমিখে
ঃ এ এক ইচ্ছার মৃত্যু—মনে ফিরে কখনো পাবে না।

মিছিল নগরী

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কলকাতা মহানগরীকে মিছিল নগরী বলে উল্লেখ করেছেন, শ্রীনেহরুর বিদ্রূপাত্মক উক্তি অপ্রিয় হতে পারে, অসত্য নহে। এই মহানগরীতে বসবাসের সৌভাগ্য যাঁদের রয়েছে তাঁরাই জানেন বিভিন্ন মিছিলের দাপটে প্রাত্যহিক জীবন কি ভাবে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। কলকাতায় মিছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এবং তার আকৃতি ও প্রকৃতিও বিভিন্ন, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে চলেছে শ্রমিকের শোভাযাত্রা, "মানতে হবে" ধ্বনি চীৎকার করে চলেছে নগর উপকণ্ঠের চাষীরা, "গদী ছাড়ো" দাবী বাস্তুহারাদের, বিভিন্ন পোষ্টার প্লাকার্ড নিয়ে চলেছে ছাত্রেরা, খোলকরতাল বাজিয়ে চলেছে কোন ধর্মীয় শোভাযাত্রা, জাতীয় পতাকা সামনে নিয়ে ব্যাণ্ডবাদ্য সহকারে চলে কোন ধনাঢ্য পরিবারের বিয়ের শোভাযাত্রা, 'হরি বোল' ধ্বনি তুলে চলেছে কোন সম্মানিত ব্যক্তির নাতিক্ষুদ্র শবযাত্রা—মিছিলের এসব অতি পরিচিত রূপ ছাড়াও ভিন্ন রূপের মিছিলও অপ্রচুর নহে। সম্প্রতি এক নতুন ধরণের শোভাযাত্রা প্রায়ই দেখা যায় যা সরকারী পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এ ধরণের শোভাযাত্রার নাম দেওয়া যেতে পারে স্থানু-মিছিল। কোন বিশেষ সম্মানিত বিদেশী বা এদেশী ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে হঠাৎ নগরীর প্রধান কএকটি পথের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় ফলে শত সহস্র লোক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

এই সব চলমান বা স্থানু শোভাযাত্রার দাপটে নগরীর বিশৃঙ্খল যানবাহন ব্যবস্থায় অধিকতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, মুমূর্ষু রোগী সময়মত হাসপাতালে পৌঁছাতে পারে না, দূরের যাত্রী ট্রেন ফেল করে, অফিসযাত্রী প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ট্রামে বাসে ঝুলে যেতে বাধ্য হয়, সময়মত ট্রাম বাস না পেয়ে লোকের মনে বিরক্তি আর উদ্বেগ জমে ওঠে ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, বিশেষ অভ্যাগতদের আগমনের ফলে যখন শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে যানচলাচল হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন চেতলার লোকও অকারণে যানবাহনের অসুবিধা ভোগ করে।

সংখ্যাধিক মিছিলের এই সব আপাতদৃষ্ট অসুবিধা ছাড়াও সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া রয়েছে। শিল্পনগরী কলকাতার বিভিন্ন মিছিলের মধ্যে শ্রমিকদের মিছিলই সংখ্যায় অত্যধিক। শ্রমিক শোভাযাত্রার নিত্যনৈমিত্তিকতার ফলে এমন ধারণার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে—কলকাতায় শ্রমিক বিক্ষোভ প্রবল এবং অনুরূপ ধারণা ভারতের অন্যান্য প্রান্তে, এমনকি দেশের বাইরেও, কিছু পরিমাণে প্রসার লাভ করেছে। ফলে এই নগরীতে নতুন কোন শিল্প গড়ে তোলার জন্যে অর্থ বিনিয়োগে অবাঙ্গালী পুঁজিপতিদের মনে দ্বিধা জন্মানো স্বাভাবিক। বর্তমানে নতুন শিল্পে অর্থ-লগ্নীর ক্ষমতা বাঙ্গালীর নেই, সরস্বতীর আরাধনায় নিমগ্ন থেকে বাঙ্গালীসমাজ লক্ষ্মীকে বিমুখ করেছে।

যুদ্ধ দেশবিভাগ ও তার প্রতিক্রিয়ায় বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। বেকার সমস্যা এই রাজ্যে ভয়াবহ রূপধারণ করেছে, বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে এই রাজ্যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অধিকতর শিল্প-সংস্থার সৃষ্টি অপরিহার্য্য যাতে শত শত বেকার যুবকের কর্মলাভ ঘটতে

পারে। সরকারের এক প্রচেষ্টায় এত নতুন শিল্প গড়ে তোলা অসম্ভব, সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হয় তার জন্যে পুঁজিপতিদের বেসরকারী প্রচেষ্টায় নতুন শিল্প সংস্থা গঠন অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং নতুন শিল্প-সংস্থা গড়ে তোলার মত উৎসাহ যাতে পুঁজিপতিদের হয় তার জন্যে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু কারণে অকারণে ধর্মঘট ও প্রতিনিয়ত বিক্ষোভ মিছিল এই পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক নহে।

সভা শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার গণতন্ত্রের মূল নীতি। পৃথিবীতে তথাকথিত প্রগতিশীল দেশ একাধিক রয়েছে যেখানে শ্রমিকদের এই মূল অধিকার স্বীকৃত নহে—এবং ধর্মঘট বা সভা শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের শাস্তি স্বরূপ এমনকি মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। আনন্দের বিষয় আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে শ্রমিকদের এই মূল অধিকার স্বীকৃত কিন্তু সাংবিধানিক অধিকারের যাতে অপপ্রয়োগ না হয় সে দিকে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। দেশের ও শ্রমিক সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে শ্রমিক-আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব শ্রমিকনেতাদের এবং এই দায়িত্বের গুরুত্ব সব সময়ে তাঁদের সচেতন থাকতে হবে। রাজনীতির সংস্রব বর্জিত সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে শ্রমিক-নেতারা তথা রাজনৈতিক নেতারা এই দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত বলে মনে হয় না।

সাংবিধানিক অধিকার খর্ব না করেও নগরীর পথে বিভিন্ন মিছিলের সংখ্যা কমাতে হবে। তখন স্বল্প যে কটি মিছিল হবে তার যথাযথ গুরুত্ব থাকবে এবং নিতানৈমিত্তিক শোভাযাত্রা নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনে বিপর্যয় আনবে না ও তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিও ব্যাহত হবে না।

শ্রীনেহরুর উক্তিতে অহেতুক উষ্মা প্রকাশ না করে ধীর মস্তিষ্কে এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মিছিল ও বিক্ষোভের জন্যে রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্ব অপ্রধান নহে। সুতরাং, সরকারী ও সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সমবেত প্রচেষ্টায়—প্রাত্যহিক মিছিলের সংখ্যাহ্রাসের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। আশা করা যায় এই প্রচেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিত মিছিল নগরীর পথে আর দেখা যাবে না এবং শ্রীনেহরুর আগমন উপলক্ষে অপ্রয়োজনীয় যে দীর্ঘ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় তাও বাতিলের তালিকায় থাকবে।

উৎপল চৌধুরী

নাটক পাঠকের সমস্যা কি ?

বৈশাখের সমকালীনে মাধব রায়ের নাটক পাঠকের সমস্যা মনোযোগ দিয়ে পড়েও তাঁর বক্তব্যটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। আজকের পাঠক নাটককে অবজ্ঞা করেনা—একথা তিনি বলেছেন। তাহলে তারা নিশ্চয় নাটক সম্বন্ধে আগ্রহশীল। তাহলে সমস্যাটি কি নাটকের অভাব ?

নাটক পাঠকের সমস্যা আলোচনায় অভিনয়কলার কথা অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়, তবু তর্কের খাতিরে স্বীকার করছি কথাটা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু লেখক, অভিনেতাদের হাতে নাটক পড়লে কি হবে বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন ? অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় টেক্‌নিকের কথা নিয়ে কোন

আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে আসার ফলে এইটুকু জোর করে বলতে পারি শিশিরকুমারের টেকনিক অনুসরণ করলে যে কোন তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যকারের নাটকও প্রথম শ্রেণীতে উঠতে পারে। নাটকবন্ধটাই জাহান্নামে যাবার সোজা রাস্তা যাঁরা মনে করেন লেখক তাঁদের সঙ্গে সমমত পোষণ করলে বলার কিছু নেই, তবে দোহাই ধর্মাবতার কুকুরকে ঝোলাবার আগে অকারণ দুর্নামটা দেবেন না।

মাধববাবু প্রকাশক, পাঠক, মায় লেখক সকলকেই একদিক থেকে দোষী নির্দেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য যদি নির্ভুল হয় তাহলে সমস্যা আর থাকে কোথায় ? পাঠক মুখ একথা তাঁর মত লোক বলে নিস্তার পেতে পারেন অন্যরা নয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মনের বিক্ষিপ্ততা যে কোন বস্তুকে সম্যক অনুধাবনের পরিপন্থী। সুতরাং নাটকে কল্পনা অনেকটা আবশ্য হতে বাধ্য কারণ তা নাহলে বক্তব্যটা সরাসরি মনে ঢোকেনা। অথচ লেখক বলছেন, নাটকে কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করে পাঠক পাত্র পাত্রীকে চোখের সামনে তুলে ধরবে। তর্কের খাতিরে কথাটা মানলেও আজকালকার নাট্যকারের সুদীর্ঘ মন্তব্যনির্দেশ থাকার পরও কল্পনার অবকাশ আছে বলে কি তিনি বিশ্বাস করেন ?

সুপাঠ্য নাটক যে হয়না এমন কথা বলছিনা কিন্তু শুধুই সুপাঠ্য নাটক খানিকটা সোনার পাথর বাটির মত। লেখক যে সব নাট্যকারের সুপাঠ্য নাটকের কথা বলেছেন তাঁরা সকলেই মঞ্চ সফল নাট্যকার একথাটা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন কেন বুঝলামনা। চেখভের যে নাটকগুলি সুপাঠ্য (এসম্বন্ধে মতান্তর থাকতে পারে) সেগুলি মঞ্চে অভিনীত হয়ে নানা পরিবর্তনের পর বর্তমান রূপ নিয়েছে। ইবসেন সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। শ'রও অধিকাংশ নাটকই মঞ্চে বিদগ্ধ দর্শকের কাছে দর্শনীয় বস্তু বলেই বোধ হয়েছে। ওনীল বা প্রিসলের নাটকের সবচেয়ে বড়গুণ তার অভিনয়ের ওপরই নির্ভরশীল। টেনেসি উইলিয়ামসের সবচেয়ে কণ্ঠপাঠ্য নাটক হচ্ছে তাঁর চরম অসফল নাটক কামিনো রিয়াল।

দেশী নাটক সম্বন্ধে যে কথা লেখক বলেছেন, সে কথাগুলো সম্পূর্ণ ভাবে না হোক অন্ততঃ আংশিক সত্য; কিন্তু আমাদের দেশের পুরানো নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের নাটকে ঐ দোষগুলো মোটেই দেখা যায় না। বরং সেগুলির পারিপার্শ্বিক ভুলে গেলে অত্যন্ত সমসাময়িক মনে হয়। আমাদের একটা মস্ত বড় দোষ যে আমরা নিজেদের অতীতকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে অভ্যস্ত। তা নাহলে লেখক প্রিসলে, ওনীল বা উইলিয়ামসের কথা বলার আগে স্বদেশী নাটকের কথা কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করতেন।

আমাদের আজকের দিনের নাটক ভাল না হওয়ার কারণ, আমাদের নাট্যকারদের মঞ্চের সঙ্গে অপরিচয়। নাট্যকাররা আপনাদের গজদন্ত মিনারে বসে বসে যা খুশী লিখবেন আর তাই সুপাঠ্য নাটক হবে এটা কি করে আশা করা যায় ? আর তা ছাড়া যে সব দোষের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন অন্য দেশে যে তা দেখা যায়না এমন নয়। কিন্তু ওদেশে যে অনেক কম তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তার একটা সহজ কারণ হচ্ছে ওদেশের নাট্যকাররা নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ওদেশে সফোক্লিস ঈসকাইলাস, ইউরিপিদিস প্রমুখ গ্রীক নাট্যকার, শেক্সপীয়র শ' ইবসেন, চেখভ ইত্যাদি নাট্যকারের নাটক না পড়ে কেউ নাটক লেখবার কথা কল্পনাই করতে পারেনা আর আমাদের নাট্যকাররা কিছু না পড়েই নাটক লেখেন কিম্বা বড়জোর বিদেশী কিছু নাট্যকারের কিছু বই পড়ে লায়েক হয়ে গেছেন মনে করেন।

আমাদের দেশের নাট্যকারের ব্যর্থতার প্রধান কারণ যে মঞ্চের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা তাও অগ্রেই বলেছি, কিন্তু আরও একটা বড় কারণ নাটকের দুর্বল কাঠামো। এসম্বন্ধে

লেখকের কথার সঙ্গে আমি একমত। তবে এইপ্রসঙ্গে নাট্যকারদের অন্যানির্ভরশীলতা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন লেখক তা মেনে নিলেও এইটুকু কৈফিয়ৎ দিতে পারি যে, কোন দেশের কোন নাট্যকারই এই দোষ মুক্ত নন। শেক্সপীয়রকে বার্বেজের কথা ভেবে নায়কের বয়স ক্রমশঃ বাড়াতে হয়েছে, তাই ১৮ বছরের রোমিও থেকে ক্রমে ক্রমে বুড়ো কিংলীয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর নায়করা। শুনা যায় লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যু সংবাদে বিচলিত ম্যাকবেথের কথাগুলো বার্বেজের আগ্রহে লিখতে হয়েছিল তাঁকে। এছাড়া তখন পুরুষ স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করত বলে সেক্সপীয়রের নায়িকারা প্রায় সকলেই ষোড়শী বা অষ্টাদশী। ইবসেন থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন কাজেই নিজের থিয়টারের লোকেদের কথা ভেবে যে তিনি নাটক লেখেন নি একথা বলতে যাওয়া বোকামী। এমন কি অমন যে শ র্যার ভাষাকে সবাই ভয় করত—তিনিও এলেন টেরী বা মিসেস ক্যাম্বেলের কথা ভেবে নাটক লিখেছেন।

পরিশেষে লেখক যে বলেছেন নাটক কিনে পাঠককে ঠকতে হয়, সেটাও কি আধুনিক নাট্যকারদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়? তাঁদের মধ্যেও যে দুএকজন নাট্যকারের নাটক পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় তাঁদের নাটক ভাল অভিনয়ও হয়। প্রকৃত কথা, নাটকে প্রয়োজন সংযমের—বাক ও ঘটনা এই দুরকম সংযম না থাকলে নাটক রসঘন হতে পারে না। সুদীর্ঘ বক্তৃতার শেষে সামান্য একটা ভঙ্গীই বোধহয় নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টিতে অনেক বেশী সাহায্য করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমস্যাটা নাটক পাঠকের ততটা নয় যতটা নাট্যকারের। মাধব রায় আলোচনাটা সেই খাতে নিয়ে গেলে আমরা অনেক বেশী উপকৃত হতাম।

রবি মিত্র

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

কলাসমালোচনায় অবনীন্দ্রনাথ

কোন শিল্পীর সৃষ্টিকে বুঝতে হলে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ও মতামতগুলি জানা দরকার। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকবেই। শিল্প সম্বন্ধে শিল্পীর যে ধারণা তা শুধু তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বাকে বুঝতেই সাহায্য করে না, তা থেকে শিল্পীর দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্যও জানা যায়। উপরোক্ত কথাগুলি শিল্পের সব বিভাগেই প্রযোজ্য। তবে দুঃখের বিষয় যে এদেশের কলাশিল্পীরা—বিশেষ করে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর প্রভৃতিরা কলাশিল্পের তাত্ত্বিক দিকটা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। আর যাঁরা করেছেন তাঁদের মতামত নিয়েও খুব বেশী—আলোচনা হয়নি বা সেই সব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সৃষ্টিকে বিচার করে দেখা হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত দলের মধ্যে অন্যতম। শিল্পকলা, বিশেষ করে চিত্রকলার মূল তত্ত্বের ওপর তাঁর মতামত সুস্পষ্ট। সুখের বিষয় তাঁর ধারণা ও মতামতগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নেই—কয়েকটি গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। "শিল্পায়ন" অবশ্যই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। এই গ্রন্থটির সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট।

চিত্রকলার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় উত্তরও দিয়েছেন। শিল্পকলার সার্থকতা, সৌন্দর্যের স্বরূপ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু সব আলোচনার শেষেই তাঁকে বার বার বলতে শোনা গেছে যে নিয়মের বাঁধাবাঁধি কলা শিল্পের লক্ষণ নয়। হয়তো কলাশিল্প সম্বন্ধে এই মৌলিক সত্যকে তিনি হৃদয়ংগম করেছিলেন বলেই সৌন্দর্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"সুন্দর অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ চলায়মান জীবন কোনদিনই পায়নি পাবেও না। ** সুন্দর অসুন্দর জীবন নদীর দুই টান— একে মেনে নিয়ে যে চললো সেই সুন্দর— আর যে এটা মেনে নিতে পারলোনা সে রইল সৌন্দর্যতত্ত্বের খোঁটায় বাঁধা।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন দুঃখকে বাদ দিয়ে সুখকে খণ্ডিত বলে অনুভব করেছেন—অবনীন্দ্রনাথও তেমনি এক অখণ্ড অনুভবের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভংগী সমন্বয়ী। সৌন্দর্যকে তিনি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন নি—অনুভব করতে চেয়েছেন। এসম্বন্ধে তাঁর ধারণা হোল— "সুন্দর বলেই সুন্দর— নানাভাব ও নানারূপের মধ্যে তার অধিষ্ঠান—"। বলাবাহুল্য এতে শিল্পী মনের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়— দার্শনিকের বিশ্লেষণ নয়। সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে 'শিল্পায়ন' গ্রন্থে যে পরিচ্ছেদটি আছে সেটি সুরু হয়েছে এই বলে—"সুন্দরের সংগে সম্পর্ক হোল মনে ধরা নিয়ে আর অসুন্দরের সংগে ঝগড়া হলো মনে না ধরা নিয়ে।" অর্থাৎ মানবমনের ভালো লাগাই হোল সৌন্দর্যের মূল কথা—এটি-ই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু পরে তিনি নানা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ভালোলাগার সূত্র ধরে সৌন্দর্যের কোন সার্বজনীন ও সর্বকালীন লক্ষণে পৌঁছানো যাবে না।

কারণ ভালোলাগা দেশকালভেদে বিভিন্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ভালোলাগার বৈচিত্র্যের কথাই উল্লেখ করেছেন— কেন ভালোলাগে তা বিশ্লেষণ করেন নি। আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন—"নানা সুন্দরের হিসাব ফল দুটি সুন্দরে এসে ঠেকে, যথা, ভাবসুন্দর ও রূপসুন্দর—" কিন্তু ভাবসুন্দর ও রূপসুন্দরের পার্থক্য কী তা বলেন নি। আবার পরিচ্ছেদের শেষে বলেছেন "বাইরে রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে, ভিতরে ভাবে ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসংগতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশলাভ করে—"। অর্থাৎ তাঁর মতে "সুসংগতি"ই সৌন্দর্যের স্বরূপ। কিন্তু চিত্রকলায় 'সুসংগতি' কীসে হবে? রেখা ও বর্ণিকার ভারসাম্য রক্ষায়? কিন্তু বৈষম্যও কী নানা জায়গায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেনা? অবনীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের আলোচনা করেননি।

বস্তুতঃ এসম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের মতামত সৌন্দর্যের স্বরূপ বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক নয়। অবশ্য এর কারণ হয়তো তিনি সমস্যাটিকে চিত্রশিল্পীর দৃষ্টি নিয়েই দেখেছেন— দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে নয়।

এরপর অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকলায় বাস্তবতার স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শিল্পের আদিযুগ হতেই যে বাস্তবানুগ ও কল্পনাশ্রয়ী দুধরণের শিল্পকলাই যে সৃষ্টি হয়ে এসেছে একথা স্বীকার করেছেন তিনি। এই সংগে এও স্বীকার করেছেন যে সার্থক শিল্প সৃষ্টিকে বাস্তবানুগ হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বরঞ্চ যে শিল্পকলা সুধুমাত্র বস্তুর প্রতিবিম্ব তা নিম্নশ্রেণীর শিল্প। তাঁর মতে— "স্থান কাল পাত্র এদের বিজ্ঞাপন দেওয়াই তো সুধু তো শিল্পীর কাজ নয়— যথাযথ রূপটার প্রতিবিম্ব দিয়ে চলা মানে রসকলাকে ফোটো-চিত্রকলার বিজ্ঞাপনের কোঠায় নিয়ে বন্ধ করা, সুর ছেড়ে হরবোলার বুলি বলতে ধরা।"

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায়ও বাস্তবের যথাযথ অনুগমন অনুপস্থিত। অবশ্য অতি আধুনিক মাপকাঠিতে বিচার করলে তাঁর ছবিতে distortion নেই বল্লেই চলে। কিন্তু তা না থাকলেও তাঁর শিল্পে বাস্তবের আদর্শায়ন রয়েছে। বাস্তবকে কল্পনার রামধনুরঙে রঙীন করে তোলা হয়েছে।

এছাড়া অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও তৎকালীন পশ্চিমী শিল্পধারার সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর ছবিকে অতীতের পুনরাবৃত্তি বলে মনে করার কোন উপায় নেই। এ বিষয়ে তাঁর মতামতও অতি সুস্পষ্ট। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে শুধুমাত্র প্রাচীনের পুনরাবৃত্তিতে বা ঐতিহ্যের অনুবর্তনে কোন শিল্পেরই গৌরব নেই। আমাদের প্রাচীন শিল্পকলার ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে, কিন্তু শুধু অতীতের রোমন্থনে প্রকৃত শিল্প সৃষ্টি হতে পারেনা। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—"অতীতের শিল্পসম্পদ হারিয়ে বসা আমাদের শিল্পের পক্ষে দুর্ঘটনা, কিন্তু শুধু তাই রইল একালের অর্জিত কিছুই রইলনা—এটা শিল্পের বাঁচার পক্ষে অনুকূল অবস্থা মোটেই নয়।** নকল নিয়ে গৌরব শিল্পরাজ্যে নেই— আসলেরই আদর আছে সেখানে।"

বস্তুতঃ এবিষয়ে তাঁর মতামত এতই স্পষ্ট যে তাঁর প্রকৃত শিষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁরা তাঁর কাছ থেকে শুধু চিত্রকলার প্রথা প্রকরণ বা আঙ্গিকই শিক্ষা করেন নি, তাঁর শিল্পাদর্শকেও হৃদয়গম করেছেন তাঁরা কখনই সর্বতোভাবে গুরুর অনুগমন করবেন না। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই যে তাঁর শিষ্যেরা গুরুর আঙ্গিক বিষয়বস্তু দৃষ্টি কোণ সবকিছুরই যথাযথ পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও শিষ্যস্থানীয় কয়েকজন প্রখ্যাত চিত্রকরের সৃষ্টি দেখে একথাই মনে হলো যে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শের এদিকটি নিয়ে তাঁরা বিশেষ চিন্তা করেননি।

শিল্পসৃষ্টির গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে সৃষ্টি রসের প্রবৃত্তি হতে উদ্ভূত হলেই তা কলাশিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে। তাঁর মতে নিছক প্রবৃত্তির প্রকাশে কলাশিল্প সৃষ্টি হয় না। রসবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিই প্রকৃত কলাশিল্প সৃষ্টি করে। তাঁর মতে প্রিমিটিভ আর্টের মূলেও রয়েছে নিছক প্রবৃত্তি নয়, বুদ্ধি ও রসবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি। কথাটা সন্দেহ নেই। তবে সৌন্দর্যের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে যেমন তিনি বিশ্লেষণের পক্ষে না গিয়ে নিজের উপলব্ধিটুকুই শুধু বিবৃত করেছেন এক্ষেত্রেও তেমনি। প্রশ্নকরা যেতে পারে রসের প্রবৃত্তি বা রসবোধ বলতে কী বোঝায়? মানবমনের সৌন্দর্যবোধ? তা যদি হয় তবে অনেক আপাত-অসুন্দর সৃষ্টি ও শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত হোল কী করে? অথবা রসবোধ বলতে এখানে অলংকার শাস্ত্রের সব কটি রসকেই বোঝাচ্ছে? কিন্তু রঙের অপচয় বা রেখার বৈলক্ষণ্যওতো মানবমনে বিস্ময় রস জাগায়—সেক্ষেত্রে তাকে রসবুদ্ধিজাত বলে ঘোষণা করতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ এসব প্রশ্ন তোলেন নি। তবে এবিষয়ে তাঁর বর্ণিত উপলব্ধিগুলি নিয়ে আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে যে রসবোধ বলতে অনেকক্ষেত্রেই তিনি মূলতঃ সংযমকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ মানবের আদিযুগের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যের কথাও আলোচনা করেছেন তাঁর মতে আদিযুগের শিল্পপরচনাতে মানববিচিত্রের রঙ দেবার ও রেখা টানবার প্রবল প্রবৃত্তির ছাপ রয়েছে। মানবশিশুদের যৌবনকালে রঙ ও রেখার এই প্রাবল্য ঘুচে গিয়ে তারা রসপ্রকাশের মাধ্যম মাত্র হয়ে উঠেছে। কথাটা সত্যি। আদিমানবের শিল্পকলা (প্রিমিটিভ আর্ট) এবং সেই শিল্প ধারার বাহক লোকশিল্প মূলতঃ জোরালো রঙ ও রেখার উৎসব। স্পষ্টই বোঝা যায় যে রেখার নিজস্ব আবেদনটুকু প্রকাশের দিকেই শিল্পীদের প্রবণতা ছিল বেশী। কিন্তু কালক্রমে "বিষয়বস্তু" এসে রঙ ও রেখাকে তাদের প্রাধান্য থেকে সরিয়ে দিলে। অর্থাৎ শিল্পকলার উষাকালে আমরা সুরু করেছিলাম অ্যাবস্ট্রাকসন দিয়ে— ক্রমশঃ আমরা বাস্তবানুগতার দিকে এগিয়ে চললাম। অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে হাওয়াটা কিছুটা উল্টো দিকে বইতে সুরু করেছে। 'আধুনিক' শিল্পকলার গতি অ্যাবস্ট্রাকসনের দিকেই।

এধরণের নানা বিষয় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে এ আশংকায় বিস্তারিত আলোচনায় বিরত থাকলাম। তবে একথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে কলা সমালোচনায় ও কলাশিল্পের তত্ত্ব বিশ্লেষণের নানাদিক নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা ভবিষ্যৎ কলাসমালোচকদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আর তাঁর চিত্রকলার রসোপলব্ধির জন্যও এই আলোচনাগুলি অপরিহার্য। রসিক মহল এ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করলে দেশবাসী উপকৃত হবেন।

মীরা দত্ত

স মা জ স ম স্যা

সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ব্যথা

প্রতি বৎসর বাঙ্গলার বাইরে সংস্কৃতি প্রচারের জন্য একদল ব্যক্তি সম্মেলন করে থাকেন। উদ্দেশ্য সংস্কৃতির বিনিময়। যেখানে সম্মেলন হয়, সেই স্থানের অধিবাসীর সংগে পরিচয়ের মারফৎ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ মিলবে। ফলে আমরা যেমন তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারব। তেমনি তারাও আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করবে। একথা ঠিক যে, ভারত-বর্ষের অনেক অঞ্চলের অধিবাসীরা আমাদের বই তাদের নিজেদের ভাষায় পড়তে পারছে। কিন্তু সেটা কি বাঙ্গলার বাইরে সম্মেলনের জন্য না বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্যে? এই ধরণের সম্মেলন অন্য সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে এখনও পর্যন্ত সক্ষম হয় নি। কিন্তু পারস্পরিক যোগাযোগ, পরিচয় ও মত বিনিময় দ্বারা আমরা কতটা প্রভাবান্বিত হয়েছি, এ প্রশ্ন সংগতভাবেই করা চলে। কয়েকবৎসর আগে যাঁরা লক্ষ্ণৌতে সম্মেলন করেছিলেন এবং এ বৎসর জব্বলপুরে, সময়ের ব্যবধানে তাঁদের মধ্যে খুব বেশী কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? ভারত-বর্ষের বাইরেও বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতি-বিনিময়ের জন্যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়েছে। অনেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকও সেই দলে স্থান পেয়েছিলেন। ফিরে এসে অনেক মুখরোচক কাহিনীও রচনা করেছেন। কিন্তু সেই সমস্ত দেশের সংস্কৃতির সংগে আমার সংস্কৃতির কতখানি প্রদান হল, এ প্রশ্নে অনেকেই কোন উত্তর খুঁজে পাবেন না!

আর একদল ব্যক্তি আছেন, সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে যাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এঁরাই প্রতি বৎসর কলকাতাতে বিভিন্ন নামের সংস্কৃতি সম্মেলন করছেন। উদ্দেশ্য বাঙ্গলার প্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। এই সংস্কৃতি রক্ষার মানসিই অনেকে অন্যরাজ্যে বাঙ্গালীদের বসবাসের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা আন্দামানে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রচেষ্টার মধ্যে সংস্কৃতিকে হত্যাকরবার ষড়যন্ত্র দেখতে পেয়েছিলেন। বর্তমানে দণ্ডকারণ্য বা অন্য প্রদেশে বাঙ্গালীদের বসবাসের কথা বললে সংস্কৃতি-বিনাশের আশংকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এঁরা সংস্কৃতি বলতে কি বোঝেন? কি তাঁরা রক্ষা করতে চান? আর কেমন করেই তা রক্ষা করা সম্ভব?

সংস্কৃতির অর্থ অনেক ব্যাপক। সংস্কৃতিই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে তৈরী করে থাকে এবং সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা হলেও বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে টেলর সংস্কৃতিকে অল্প কথার মধ্যে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা এখনও অদ্বিতীয়। সংস্কৃতি হল জ্ঞান, বিশ্বাস, সাহিত্য ও শিল্পকলা, আইন, নীতিবোধ, রীতিনীতি এবং সমাজের একজন হিসাবে মানুষের ক্ষমতা ও অভ্যাসের সমষ্টিগত এককরূপ। এই বিচিত্রধারাগুলি সমাজের মানসিক গঠন, তার রীতিনীতি, অভ্যাস, নীতিবোধ ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সামাজিক ধ্যান-ধারণা এবং অভ্যাস একটি গোষ্ঠী বা সমাজ উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করে। সংস্কৃতির একটি উপাদানের পরিবর্তন হলে, সামাজিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে। অর্থনৈতিক এবং চিন্তাধারার পরিবর্তন তাই সমাজকে এক যায়গায় থাকতে দেয় না, সামাজিক

মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায়। যে কোন কারণে সমাজের পুরাতন বন্ধন শিথিল হওয়ার সংগে সংগে সামাজিক-ঐক্য বজায় রাখবার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন প্রয়োজন। যে সমাজ এই পরিবর্তনকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারে, প্রয়োজনমত নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, আচার ব্যবহার, নীতিবোধ গ্রহণ করে সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, সেই সমাজই গতিশীল। গ্রহণ করবার ক্ষমতার মধ্যেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। লাইকারগাস প্রবর্তিত স্পার্টার সভ্যতার অল্পদিনের মধ্যে বিলুপ্তি এবং প্রায় আড়াই শতাধিক বৎসর ব্যাপী রোম-সভ্যতার অস্তিত্বের কারণ সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুঁজতে হবে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের জড়ত্ব বিভিন্ন দেশে সামাজিক অগ্রগতির পথে কম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নি। পরিবর্তনকে স্বীকার করে সামাজিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে নূতন চিন্তার প্রবাহের পথকে সুগম করেই সংস্কৃতিকে শুধু রক্ষা নয়, পরিপুষ্ট করতে হয়।

কিন্তু সংস্কৃতি বিলুপ্তির আশংকায় যারা সর্বদা শঙ্কিত, তারা কি রক্ষা করতে চান? যা প্রাচীন, যা সমাজের নিজস্ব, তাই যদি রক্ষা করতে হয়, তা হলে তো সাঁওতাল ও আদিবাসীদের বনের মধ্যেই রাখতে হয়। কারণ বাইরে আনলেই তো তাদের সংস্কৃতি লোপ পাবে! কিন্তু আমরা তাদের নিশ্চয়ই বনের মধ্যে রাখতে চাইনা। সভ্যতার আলোর মধ্যে আমাদের মতই তাদের দেখতে চাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উপজাতিরা যখন শিক্ষিত হয়, তখন তাদের চলাফেরা, রীতিনীতি, অভ্যাস, নীতিবোধের বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এই পরিবর্তন সাধারণতঃ আমাদের অভীপ্সিত পরিবর্তন না হওয়ায় আমরা ব্যথিত হই। মোটকথা, আদিম সমাজের সব কিছু আমরা রক্ষা করতে চাইনা। তাদের সামাজিক রীতিনীতির মহত্তর দিকটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সংগে সংগে এই মহত্তর বৈশিষ্ট্য অবসানের জন্যই আমরা ব্যথিত হই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে দুঃশ্চিন্তার অন্ত নেই, সংস্কৃতির অর্থ তাদের কাছে স্পষ্ট নয় বলেই মনে হয়। গ্রাম্য-সমাজের অবসানে লোকনৃত্য লোপ পেতে বসেছে। অথবা সামাজিক ঐক্য-বোধকে বজায় রাখবার জন্যে এর প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সহরে এনে প্রদর্শনী বা লোকনৃত্যের জন্যে পুরস্কৃত করবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে কিন্তু এভাবে তো ওগুলিকে রক্ষা করা যাবে না। সমাজ-জীবনে স্বাভাবিকভাবে যে পরিবর্তন ঘটছে, সেই পরিবর্তনকে অভীপ্সিত ধারায় প্রবাহিত করতে হবে। নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্যে উপর থেকে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয়। সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখা এবং পরিপুষ্টির জন্যে সামাজিক মনকে গ্রহণশীল রাখা প্রয়োজন। পরিবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলে সংস্কৃতি বজায় রাখা যায় না। যার অস্তিত্ব বজায় রাখে, তা সমাজে ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে মাত্র।

আমাদের সংস্কৃতি বিলুপ্তির আশংকায় যারা শঙ্কিত তারা কিন্তু সব সময়ে এক ধরণের যুক্তি ব্যবহার করেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগত বৈষম্যে সায় দিতে তারা অসমর্থ। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের অন্যতম যুক্তি হল, হুলু ও জোশাদের সংস্কৃতি রক্ষা করবার জন্যেই পৃথক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। আফ্রিকানদের ইংরেজীও শিখতে দিতে চায় না। নিজের ভাষায় নিজেদের স্কুলেই যখন তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়, তখন কি আমরা খুসীতে উদ্বেলিত হই? আফ্রিকানদের সংস্কৃতি বজায় রাখবার এই প্রচেষ্টাতে কই আমরা তো অভিনন্দন জানাই না। যখন ইংরেজী-ভাষা পরিত্যাগের কথা ওঠে, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা প্রতিবাদ করি। কারণ আমরা জানি যে বাইরের সংগে যোগাযোগ বিনষ্ট হলে নূতন চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। আমাদের সংস্কৃতিও বেঁচে থাকবে না। ইংরেজীভাষাকে আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে

রাখিনি বলেই আমাদের চিন্তাধারা বলিষ্ঠ হতে পেরেছিল। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকেও আমরা পেয়েছিলাম। ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের মারফৎ ভাববিনিময়ের সুফল আমাদের অজানা নয়। বাইরে সংস্কৃতি প্রচার করতে চাই ঐ কারণেই।

আমরা যখন সংস্কৃতি প্রচারে ব্রতী হই, যখন সংস্কৃতি রক্ষায় দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করি, তখনও আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃতরূপ আমাদের কাছে অজানা। আমরা যখন একটি জাতির সংস্কৃতির কথা বলি, তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত বা বুদ্ধিজীবির ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও অভ্যাসকে জাতির প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করতে পারি না। এক অর্থে বুদ্ধিজীবি বা শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন একটি বিশেষ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন না। পৃথিবীর সর্বত্রই বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে একটি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রার বিভিন্নতা সত্বেও সব-দেশের বুদ্ধিজীবিদের মোটামুটি একগোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। অবশ্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অবসান অসম্ভব। একই ভাষাভাষী, একই চিন্তাধারায় আস্থাবান দুইজন ব্যক্তির মধ্যেও সব ব্যাপারে মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং জাতীয়-সংস্কৃতি বলতে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির ধ্যানধারনাকেই গণ্য করবনা। বৃহত্তর জনসমষ্টির ধ্যান-ধারণাই একটি জাতির নিজস্ব-সংস্কৃতির সত্যিকারের মাপ-কাঠি। আমরা যে বঙ্গ সংস্কৃতির গর্ব করি সেই সংস্কৃতির আসল রূপ জানতে হলে, গ্রাম্য-সমাজের দিকে নজর দিতে হবে। গ্রাম্য-সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক যতই মধুময়, সরল এবং সাধারণ বলে প্রচার করি না কেন, তা কয়েকটি মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছু নয়। সহরে বা সহরের আশে পাশে, এমনকি গ্রামের সমাজ-জীবনেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে পরিবর্তন কতটুকু?

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেকলে বাঙ্গালী চরিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে পরিপূর্ণ সত্য না থাকলেও আংশিক সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। তিনি লিখেছিলেন : Courage, independence veracity are qualities to which his constitution and his situation are equally unfavourable..... Large promises, smoth excuses, elaborate tissues of circumstantial falsehood, chicanery, perjury, forgery are the weapons, offensive and defensive of the people of the lower ganges..... As usurers, as money changers, as sharp legal practioner, no class of human beings can bear a comparison with them.

গ্রাম্য-সমাজকে যারা ভালভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা জানেন যে, মেকলে বাঙ্গালী-চরিত্রের যে দিকটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক পরিবর্তন সত্বেও তার খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্তেও নোংরামী, ঘৃণাদলাদলি আজও বাঙ্গালীদের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষিত ব্যক্তিরা অবশ্য এসবের উপর সংস্কৃতির আবরণ দেন। শান্তে মানুষকে ভগবানের পর্যায়ে স্বীকার করা হলেও, আমাদের জীবন-যাত্রার মধ্যে তা স্বীকৃতিলাভ করে নি। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধে আজও ব্যক্তির অস্তিত্ব অস্বীকৃত। অপরের মঙ্গলের জন্য মাথাব্যথা করতে আমরা আজও অভ্যস্ত হইনি। যখন নাগা অঞ্চলে বা উপজাতিদের মধ্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হই, আমরা কখনও ভুলেও তাদের কথা ভাবিনা। আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের ফলে আমরা সেখানে সত্যাগ্রহ করি। সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের প্রতি নিন্দা-প্রচারে কখনও পরিশ্রান্ত হই না। কিন্তু ভলেও কি কখনও আমরা আফ্রিকানদের দুঃসহ অবস্থা চিন্তা করি? নিজ বাসভূমে যারা পরদেশীতে পরিণত হয়েছে, ভারতীয়দের অপেক্ষা উক্ত দেশগুলিত যাদের অধিকার সবচেয়ে বেশী, দিনের পর দিন মনুষ্যত্বের এই অবমাননা দেখেও আফ্রিকানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমরা

কখনও এক করে দেখতে শিখিনি। অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতি যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একাত্ম অনুভব করতে পারে না, তাদের সংস্কৃতির যতই মাহাত্ম্য থাকুক না কেন, তা নিয়ে গর্ব করা চলে না। শুধু বাঙ্গলা দেশ নয়, গোটা ভারতবর্ষ সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য।

ইউরোপীয়দের আমরা সর্বদা বস্তুতান্ত্রিক বলে নিন্দা করে থাকি। কিন্তু আমাদের দেশের পিছিয়ে থাকা উপজাতিদের সভ্য-সমাজের উপযুক্ত করবার জন্যে তাঁরাই সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, আমরা নই। বাঙ্গালী-সংস্কৃতির সত্যকারের রূপ দেখতে পাওয়া সম্ভবতঃ আন্দামানে। আন্দামানে বাঙ্গালী ও অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবেনা (যদিও আমাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে কখনও ক্লান্ত হইনা)। লোক দেখাবার জন্যে তাদের সংস্কৃতিবান সাজতে হয় না। সভ্য-সমাজের নীতিবোধকে তারা ইতি-হাসের বিষয় করে ফেলেছে। ঘৃণ্য দলাদলি, নোংরামীই সেখানকার প্রকৃত চিত্র। উন্নততর সমাজের জন্যে উন্নততর মানুষ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত দুই একজন ব্যক্তিকে অবশ্য সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এদের উপর নির্ভর করে কোন সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে, না। আমেরিকান সংস্কৃতির ভিত্তি রচনার ইতিহাসই একথার সত্যতা প্রমাণ করবে। নূতনবসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে দুই একজন সংস্কৃতিবান ফরাসী আদিম অধিবাসীদের উন্নয়ন এবং ফরাসী সংস্কৃতি বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন কিন্তু বাদবাকী ফরাসী নিজেদের নিয়েই মগ্ন থাক-তেন। সমষ্টিগত ঐক্য-বোধেরও অভাব ছিল। ফলে ফরাসী-সংস্কৃতি জেফারসনের মত দু'এক-জন ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করলেও, ইংরেজ-সংস্কৃতির প্রতিযোগিতায় আমেরিকার নিজস্ব সংস্কৃতির গঠনে ফরাসীরা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে নি। আমার মনে হয়, বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে রক্ষা এবং পরিপুষ্ট করতে হলে আমেরিকান সংস্কৃতির বিবর্তন থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হবে।

একথা ঠিক যে, উন্নততর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অন্য সংস্কৃতি অনেক কিছুই শিখতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সংস্কৃতি ধীরে ধীরে উন্নত হওয়ার বদলে অবনতিকেই ত্বরান্বিত করবে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালাদেশেরই সমাজ-জীবনেও বিভিন্ন প্রভাব উল্লেখ করা যেতে পারে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা তথাকথিত ভদ্র শ্রেণীর সংস্পর্শে এসে নিজেদের ভদ্র হিসাবে গণ্য করবার মানসে উচ্চশ্রেণীর মত বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করে। ফলে তাদের সমাজে যথেষ্ট নীতিবোধের অবনতি ঘটেছে। উক্ত প্রভাবকে কেউ-ই শুভ-লক্ষণ হিসাবে স্বীকার করবেন না। বিভিন্ন ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা দন্ডকারণ্যে গেলে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে স্থানীয় অধিবাসীদের। নূতন প্রভাব তাদের সমাজ-জীবনে সম্ভবতঃ অনভীপ্সিত পরিবর্তন আনবে।

সংস্কৃতি নিয়ে যারা মাথা ঘামান, সংস্কৃতির আসল চেহারা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যাঁদের কাছে স্পষ্ট, তাঁরা সমস্যার ভয়াবহতা দেখে পশ্চাদপসরণ করেন। অনেকে পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রভাবের দ্বারা বর্তমান সংস্কৃতিকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের মন এতবেশী জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা কোন কিছু শিখতে চাইনা। আমাদের এই বৈশিষ্ট্য জীবনের সবক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে। ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলতে আমাদের দেশ প্রায়ই বাইরে যায়। বাইরে থেকেও দেখে আসে। কিন্তু উন্নততর কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্রও কি আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি? এই মানসিক জড়ত্বের জন্যে আমাদের সমাজে জ্ঞানের প্রবাহ অনুপস্থিত। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন চিন্তাধারাকে সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত করবার কোন সুযোগ আমাদের সমাজে অন্ততঃ নেই। এমন একটি সংস্কৃতির আর যে

গুণেই থাকুক না কেন, বর্তমান পৃথিবীতে ব্যক্তির বিকাশের উপযোগী রসদ সরবরাহ করতে অসমর্থ।

রামমোহন রায় এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা শিল্পপ্রসার এবং প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মারফৎ সংস্কৃতিকে গতিশীল সমাজের উপযোগী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য কারণের সঙ্গে ধর্মের আবরণের জন্য সেই ধারা আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিদ্যাসাগরই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর চোখের সামনে সংস্কৃতির পুরো ছবিটি ছিল। পুরাতন জীর্ণ সমাজকে ভিতর থেকে পরিবর্তন করতে না পারলে কোন প্রচেষ্টাই সংস্কৃতির সজীবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। সমাজকে এইভাবে পরিবর্তিত করা যে দুরূহ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমস্যার ব্যাপকতা হয়ত নৈরাশ্যকে নিকটতর করবে। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাঁচাবার এটাই একমাত্র পথ। নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, বঙ্গ-সংস্কৃতি নিয়ে যতটা গর্ব করা সম্ভব, আত্মগ্লানির পরিমাণ তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যা খারাপ তা দুষ্ক্ষতের মতই অপারেশান করতে হবে। অপরের যা সুন্দর তা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণশীল করলেই কর্তব্যের সমাপ্তি হবে না। সমাজের সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে চিন্তাধারার প্রবাহ যাতে অজ্ঞতম লোকের নিকটও পৌঁছায়, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। সংস্কৃতি নিয়ে হৈ চৈ করে, দুঃশ্চিন্তার ভাব দেখিয়ে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় কিন্তু সংস্কৃতিকে বাঁচান যায় না। সজীব তো নয়ই।

নিরঞ্জন হালদার

স মা লো চ না

নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। বিশ্বভারতী। চার টাকা

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ॥ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং। মূল্য ২·৫০

দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য থাকবার পর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর "নারীর উক্তি" বইটির নূতন সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা বাংলাদেশে সুপরিচিতা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী হওয়া ছাড়াও তাঁর একটি বড় পরিচয় হল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে যে অল্পসংখ্যক মহিলা শিক্ষাদীক্ষায় বাংলার নারীসমাজে অগ্রণী ছিলেন, ইন্দিরা দেবী তাঁদেরই একজন। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়তা বা পরিচয়ের সূত্রে এত বিভিন্ন ধরণের প্রতিভাশালীর অতি ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসবার সুযোগ তাঁর মত খুব কম জনেরই হয়েছে। সুতরাং তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি বাংলার পাঠকদের, বিশেষ করে মহিলা পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বইটির নাম থেকেই বোঝা যায় এটি প্রধানতঃ নারীদের উদ্দেশ্যে একজন নারীর লেখা। কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা এতে নেই। সমাজজীবনের বিশেষতঃ নারীসমাজের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও আদর্শসংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের আলোচনা এতে করা হয়েছে। লেখিকার নিজের কথাতেই ক্রিয়াপদের বিশুদ্ধতার থেকেই "নারীর উক্তির" প্রাচীনতা পরিস্ফুট। এই প্রাচীনত্বের জন্যই এতে এমন কতগুলি সমস্যা আলোচিত হয়েছে যাদের সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ক্রমশঃই বিলুপ্তির পথে যেমন স্ত্রীশিক্ষার ভালোমন্দ বিচার বা অসবর্ণ বিবাহ। তবু "নারীর উক্তির" প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমেনি কারণ লেখিকা সমাজজীবনে কতগুলি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন যেগুলি আজও অত্যন্ত সজীব। শিক্ষিত নারীসমাজের সামনে একটি যুগোপযোগী আদর্শস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করবেন না। স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ও শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের সম্মুখে কোন আদর্শের অভাব খুব বেশী করে অনুভব করা যায়। সম্বন্ধের সংখ্যাধিক্যের চাপে পড়ে আমাদের হৃদয় যে ক্রমশঃই শুষ্ক এবং সংকীর্ণ হয়ে আসছে একথাও অস্বীকার্য্য। স্ত্রী স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন তা যে কোনও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোকই মেনে নেবেন। 'ভদ্রতা' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি সরস ও চিন্তাপূর্ণ।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজে পাশ্চাত্যশিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতা হয়েও লেখিকা নির্বিচারে বিদেশীদের অনুকরণ সমর্থন করেন নি। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে তিনি স্বাদেশিকতা বজায় রাখবার উপর জোর দিয়েছেন। আবার প্রাচীন হয়েও তিনি নির্বিচারে প্রাচীন সংসারকে আঁকড়ে থাকার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য খুঁজে পাননি, পুরাতন ও নবীনের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ভাষা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ হলেও সহজ। তবে মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি এবং পুনরুক্তির বাহুল্য ঘটেছে বলে মনে হয়।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী লিখেছেন শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়—তিনি শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের খুব নিকট সম্পর্শে এসেছিলেন—ব্যক্তিগতভাবে তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন— এ বই লেখবার অধিকার তাই তাঁর স্বাভাবিক ভাবেই আছে।

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে শিল্পী শিল্পীই থাকবে, বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক থাকবে সাহিত্যিক সাহিত্যই করবে, তদতিরিক্ত অন্য কোন কাজ বিশেষতঃ রাজনীতি কখনোই করবে না। গোটা মানুষ দেখতে আমরা ভয় পাই। সংসারের কোনো লোক, ধর্মচর্চায় দিনের কিছু সময় দেয়—এই রকম মানুষ ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত—এ ছাড়া জীবনের আর সবাই পায়রার খোপে বসে থাক নিজের নিজের মনোমত বকবকম করুক এই ধারণা করতেই আমরা শিখেছি। সংসারের সব নীতিই যে মূলতঃ এক সে কথা আমরা ভুলে যাই। ধর্মনীতি, সমাজ-নীতি রাজনীতি, সাহিত্যনীতি সবগুলির মধ্যেই একটা ঐক্য আছে যে ঐক্যবোধ মানবকে সম্পূর্ণ হবার সুযোগ দেয়। তাই কোন মানুষের পরিচয় শুধু তার পেশাগত হলে পূর্ণ হয় না।

শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ যে শুধু ভাববাদের অলীক কল্পনা নয়, এর সঙ্গে যে জড়িত ছিল তাঁর রাজনৈতিক মতামত, তাঁর চিন্তা, তাঁর জীবন সে কথা জানা প্রয়োজন। তাঁর ব্যক্তিগত জীব-নের মমত্ববোধ, বাংলার রাজনৈতিক তরুণদের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ, কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা তাঁর উপন্যাসগুলির অন্তরালে তাঁর জীবনের একটি নূতন অর্থ আমাদের কাছে ধরে দেয়। বাস্তব জীবনের শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের ভাব ও ভাবনার সত্যতা প্রমাণ করেন।

কিন্তু তবু একথা মনে রাখতে হবে যে এই গ্রন্থের কোন গভীর সার্থকতা নেই। কারণ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে জড়িত থাকা এবং কিছু রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ রাখার অর্থ রাজনৈতিক জীবন যাপন নয়। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন বাংলার রাজ-নৈতিক ইতিহাসকে কোনভাবে কোনরকমে প্রভাবিত করেনা—তার কোন সুদূরপ্রসারী ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নেই। তিনি নামকরা ঔপন্যাসিক, 'পথের দাবী' রাজনৈতিক মহলে জনপ্রিয় হয়েছিল তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবন আছে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাওড়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করা ছাড়া অন্য কোন যথার্থ রাজনৈতিক কাজ তাঁর জীবনে নেই। সুতরাং এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর যথার্থ মূল্য কতটুকু?

তবে এও ঠিক যে ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের জীবনের এই দিকটুকু জানলে তাঁকে বোঝা তাঁর সাহিত্য বোঝার আরও সুবিধা হবে।

মঞ্জুলা বসু

কবি সুকান্ত ॥ অশোক ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরী ॥ আড়াই টাকা।

'কবি সুকান্ত' বইখানি পড়া শেষ করে আলোচনার মেজাজ আসেনা। আসে একটা ভাব। তাই মনে হয় একটা কবিতা লিখে ফেলা বরং সহজ হতো। অশোক বাবুর ভাষায় "এজীবন সম্পর্কে জানার চেয়ে বোঝার বিষয় আছে বেশী।" বইটি শেষ হবার পর একটা অদ্ভুত করুণ সুরের রেশ মনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে।

মূলত এটা জীবনী। সেই সঙ্গে মিশেছে ছোটো ছোটো ছবি আর কাব্য জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গতি বিচার, তাই বইটি উপভোগ্য।

আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতি সাহিত্যালোচনায় ব্যক্তিগত জীবনকে প্রাধান্য দেয়। সেই দিক থেকে গ্রন্থকার কোন ত্রুটি রাখেন নি। পরবর্তী লেখকেরা এতে উপকার পাবেন। সুকান্তের কবিতাকে তাঁর জীবন থেকে সরিয়ে বিচার করা যায় না। অনেকের মত, ছেলেবেলাকার কবিতায় অনুকৃতি প্রচেষ্টায় সাধারণত সেখানে জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ কম।

আমার মত ঠিক উল্টো। ছেলেবেলায় যা প্রকাশ পায়, তা অকৃত্রিম। অবশ্য সেখানে হৃদয়ের ভাবের পরিবর্তন খুবই দ্রুত ঘটে। হয়তো খুব কম সময়ের মধ্যে একটা ভাব থেকে তার বিরুদ্ধ ভাবে চলে যাওয়াও তাদের পক্ষে আশ্চর্য নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ভাবের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিবিড় থাকে।

ছোটদের অনুকৃতি আর বড়োদের অনুকৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। সাংসারিক সংঘাতে বড়োরা হৃদয়কে পোষাকে ঢাকা রাখেন। তাদের অনুকরণেও সেই পোষাকী ঢংটি থেকে যায়।

আর একটা কথা। সুকান্ত স্বকীয় প্রতিভাকে অনেকখানিই চিনতে পেরেছিলেন। যে বয়সে অন্য সব কবি নিজের প্রতিভাকে চিনতে না পেরে বেদনাভরা মনে হতাশার গান গেয়েছেন। সে বয়সে সুকান্তের কবিতার মধ্যে ছিল একটা আত্মবিশ্বাসের সুর।

জীবনীটির উপযোগিতার যে কথাটা তুলেছিলাম, তা এই দিকটি লক্ষ্য রেখে।

প্রত্যেক কবির জীবনের খৃষ্টাব্দ কণ্টকিত কর্মতালিকা কিংবা বিরাট স্বার্থের সঙ্গে তার সংযোগ জানবার চেয়েও পাঠক আর একটা জিনিষ জানতে উদগ্রীব হন। সেটা হচ্ছে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছোটো ছোটো ছবি। মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকে সে ঘরোয়াভাবে দেখতে চায়। কবির কাব্যজীবন, বা দশের স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাগী জীবন যতই মহৎ হোক, তাতে এই ঘরোয়া রূপটুকু থাকেনা। অশোকবাবুর বইটিতে সুকান্তের ব্যক্তিজীবনের ছোটো ছোটো ছবি পাঠকের এই চাহিদা মিটিয়েছে।

সুকান্তের কবিতার অনেক পত্রিকায় অনেক আলোচনা দেখেছি। এই বইটি অবশ্য আলোচনার বই নয়। সুকান্তের ওপর মোটামুটি ধারণা দিতেই গ্রন্থকার সচেষ্ট। কিন্তু আলো-চনার দিকটি বাদ দিলে সুকান্ত সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট হয় না। গ্রন্থকার আলোচকদের প্রচ-লিত সংস্কারগুলো সাধারণভাবে মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি সর্বত্রই পূর্ববর্তী আলোচকদের সঙ্গে একমত হন নি। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এমন অনেক আছেন যাঁরা সুকান্তর কবিতার যে অন্ত-জ্বালা তাকে নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দারিদ্রের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখতে চান। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে এমন অনেক দরিদ্র মধ্যবিত্ত বাঙালী কবি আছেন বা ছিলেন, যাঁরা সংগ্রামের ধার দিয়েও যান নি।.....প্রতিটি কাব্য প্রতিভাই স্বতন্ত্র চরিত্রের অধিকারী। আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি.....তার সমাজসচেতনা মেজাজের ওপর নির্ভর শীল।.....সচেতন কবি ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও বিপ্লববাদী হতে পারেন। তাই সুকান্তের বিপ্লববাদের একমাত্র কিংবা মূল কারণ হিসাবে একমাত্র জীবনকে দায়ী করলে নিতান্তই এক যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে। আসলে বিশেষ সমাজ ও যুগচেতনার অধিকারী হবার ক্ষমতাই ..... তাঁকে শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী করেছিলো .....।" মন্তব্যটি বিবেচনার অধীন।

বইটির একটি বৈশিষ্ট্য, এতে সুকান্তের অনেক অপরিচিত রচনার উদ্ধৃতি আছে। কবিকে আরো ভালো করে চিনতে এগুলি সহায়তা করবে।

বইটির মধ্যে সামান্য একটু প্রচার ধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই মাত্রা নিয়ে একটু টানা-টানি আছে। এতে পাঠকের বাস্তবচেতনা একটু বিব্রতবোধ করে।

গ্রন্থকারের ভাষা সহজ। সুকান্ত কিশোর কবি। কিশোরদের কাছে বেশি প্রিয়। তাই কিশোরদের বোঝবার মতো বই হওয়াতে সুবিধেই হয়েছে। গবেষকজনোচিত তথ্যবাহুল্য বইটিকে সাধারণের অপ্রিয় করে তোলে নি।

ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। প্রচ্ছদে সুপরিচিত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি রক্ষা করে শিল্পত্বের পরিচয়ই দিয়েছেন।

জয়ন্ত গোস্বামী

ফুলপিঁড়ি ॥ শচীন দত্ত । পরিবেশক ঃ সিগনেট বুকশপ। কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা

বর্তমান কাব্যগ্রন্থখানি কবির প্রথম প্রকাশিত বই। শচীন দত্ত ইতোমধ্যে নানা পত্রপত্রিকায় ইতস্ততঃ লিখেছেন সত্য, কিন্তু তাতে করে কাব্যরসিক পাঠকসাধারণ তাঁর কাব্যরসব্যঞ্জনা যতখানি না হৃদয়ে সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তা পারবেন সংকলিত তাঁর বর্তমান কাব্যগ্রন্থ 'ফুলপিঁড়ি' থেকে।

'ফুলপিঁড়ি'র কবিতাবলীর মোটামুটি রচনাকাল ১৩৫৬ থেকে ১৩৬৪। এই আট বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রচিত মোট ৪৬টি কবিতা আশ্রয় লাভ করেছে আলোচ্য কাব্য সংকলনে। যদিচ মননশীলতাই আধুনিককালের কাব্যপরিমণ্ডলের অন্যতর বলিষ্ঠ প্রাণ ব্যঞ্জনা বলে বিদগ্ধ আলোচকেরা বঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথাপি বুদ্ধিবৃত্তির পাশাপাশি সুশান্ত সুরবৈচিত্র্যানুভূতিকে একেবারে অচল বলে অস্বীকার করার মধ্যেও তেমন কোনো গৌরব থাকবার বিশেষ কারণ থাকতে পারেনা বলেই অনেকের বিশ্বাস। ফুলপিঁড়ির কাব্যসংকলনের কবি প্রধানত রোমান্টিক, এবং তাঁর বর্তমান কাব্যরেখার আলপনায় কাব্যের সহজ ও সরল রূপবৈচিত্র্য পাঠক আবিষ্কার করে আনন্দবোধ করবেন বলেই আমাদের মনে হয়। কবির আন্তরিক প্রত্যাশা সামান্যহলেও তা' বিপুল সুদূর।

অবশ্য এই আনন্দবোধের সাথেই বর্তমান কাব্যসংকলনের মধ্যে একালের গভীর বেদনাবোধ-ও লক্ষ্যনীয়; তবে এই দুঃখবোধ এবং সমকালীন পরিবেষ্টনীর যন্ত্রণা, সবক্ষেত্রে কবির আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাতে পারেনি বলেই মনে হয়।

কয়েকটি কবিতাতে কবি জীবনানন্দের প্রচ্ছন্ন প্রতিধ্বনি 'ফুলপিঁড়ি'র কবিমনে সাড়া তুলছে। সেই কবিমনের স্নিগ্ধ জ্যোস্নার আকুলতা দেখতে পাই 'একটু প্রত্যাশা ঃ একফালি আকাশ, 'সীমান্তিক' ইত্যাদি কবিতায়। অবশ্য 'ফুলপিঁড়ি'র মধ্যে 'আমাকে জাগিয়ে রেখে', 'জোনাকীর জীবনী, সমুদ্র শঙ্খ, বর্ণচিত্র, প্রিয়তমা, দুই ঋতু' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে ভাব ও ভাবনার প্রগাঢ়তা এবং ভঙ্গিপ্রকরণ, কবির হৃদয় আর্তির সহজ সুচিস্মিত প্রকাশকেই নতুনতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু গদ্যাত্মক আঙ্গিকের ক্ষেত্রে (বসিরহাটে শেষ বাস, নতুন নামে) গদ্যকবিতার রীতিপ্রকরণ কবির অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে।

'ফুলপিঁড়ি'র কবিকর্মে প্রতিশ্রুতির নতুন স্বাক্ষর বিদ্যমান; তবে ভবিষৎ সমীক্ষার ক্ষেত্রে কবিকে চিত্রকলা, শব্দব্যবহার এবং ছন্দপ্রকৃতি প্রসঙ্গে আরো আন্তরিক হতে হবে।

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

সমকালীন

নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি ঃ

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা, সডাক ষান্মাসিক তিন টাকা চার আনা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

লেখকের প্রতি ঃ

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো হয়, **কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।** দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশকদের প্রতি ঃ

'সমকালীনের' গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুইখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য

ফোন ঃ ২৩-৫১৫৫